বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৫

সূচিপত্র

আমাদের কথা
তথ্য জানতে আইন -রবীন চক্রবর্তী
প্রযুক্তির ভারত ও তথ্য প্রযুক্তির ভারত কোন পথে -অমিত চৌধুরী
সাইবার অপরাধ -সায়নদীপ সরকার
জার্মান পরমাণু বোমা প্রকল্প ঘিরে রহস্য -প্রদীপ কুমার দত্ত
পরিবেশ -শিক্ষার বাহন না বোঝা -রবীন মজুমদার
পিতা, পুত্র ও এক অপবিত্র যুদ্ধ -এ পি শুক্লা (অনুবাদ: অশোক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়)
যাদুর নাম উন্নয়ন -সুমিত চক্রবর্তী
নোবেল বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রশাসনের স্বরূপ বিশ্লেষণ -হ্যারল্ড পিন্টার
চলে গেলেন হ্যারি ম্যাগডফ -অমিত চৌধুরী
চিঠিপত্র
রিপোর্ট : নদী ভাঙনের কথা -তরুন বসু
পরিক্রমা

আমাদের কথা

বিওবি প্রকাশিত হল। একবছর পর । কিছু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা আর কিছু অতীতের বিষয় নিয়ে । নতুন আইন হয়েছে -রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট । সেই আইনের নানান দিক নিয়ে ভাবনার কথা আছে । প্রযুক্তি-ভাবনা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা চলছে। সেই ভাবনার গতিপ্রকৃতিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইন্টারনেট-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে । তার নানান সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে । পরিবেশ শিক্ষা কলেজে কলেজে চালু হয়েছিল আগেই । এবার স্কুলে চালু হবে । সেই পরিবেশ শিক্ষার হালচাল নিয়ে থাকছে আলোচনা । হ্যারল্ড পিন্টার এবার সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন । ডিসেম্বরের ৭ তারিখের নোবেল বক্তৃতা-সভায় হাজির থাকতে পারেন নি শারিরিক অসুস্থতার কারণে । সেখানে তাঁর রেকর্ড করা বক্তৃতা শোনানো হয় । তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন ইরাকের ওপর মার্কিন বাহিনীর হানাদারির ঘটনার । নোবেল বক্তৃতায় এমন সোচ্চার রাজনৈতিক বক্তব্য আর কখনও শোনা যায় নি । বক্তৃতার সেই অংশটুকুর অনুবাদ থাকছে এই সংখ্যায় ।

এ সবই সমসাময়িক বিষয় । অতীতের ঘটনা হিসেবে লেখা হয়েছে জার্মান পরমাণু বোমা প্রকল্প ঘিরে বিতর্কের কাহিনী । প্রশ্ন হল জার্মান বিজ্ঞানীরা কি পরমাণু বোমা বানাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, নাকি ইচ্ছে করেই বানান নি ? এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিতর্কমূলক লেখা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। *বিওবি*-তে এই প্রথম। থাকছে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে একটি লেখা । এছাড়া রয়েছে বিটি-কটন চাষের পরিণাম, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বৈঠক, গুগুল-আর্থ সাইট নিয়ে বিতর্ক নিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের লেখা ।

পত্রিকা প্রকাশ নিয়ে সংশয় ছিল । গত বছরের পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় এখনো মেটানো যায় নি । তার ওপর ফের ধার ? অনেকেই রাজি ছিলেন না । প্রশ্ন উঠল তাহলে বই মেলায় বসা হবে কি নিয়ে ? ঠিক হল যত ছোট আকারেই হোক *বিওবি* বেরোবে । কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে । কে ছাপতে রাজি হবে ? ঠিক হল নিজেরাই কম্পোজ করব । তাতে কিছু খরচও বাঁচবে । শুরু হল দৌড়-ঝাপ । অল্প কিছুদিনের চেষ্টায় আনাড়ি লোকজনের হাতে কম্পোজ করা *বিওবি* অবশেষে প্রকাশিত হল ।

একটা ভাল খবর । বিওবি-র একটি ওয়েবসাইট হয়েছে । তৈরি করেছি নিজেরাই । সেই আনাড়ি লোকেরাই। দূরের বন্ধুদের কাছে পত্রিকা পৌঁছতে পারছি না । এবার তাদের সাথে যোগাযোগ তৈরি হবে আশা রাখি । আমাদের সাইটের ঠিকানা হল: <www.bigganobiggankarmi.org> ।

পরিচালকমণ্ডলী

তথ্য জানতে আইন হয়েছে
রবীন চক্রবর্তী

‘রাইট টু ইনফরমেশন’ বা ‘তথ্য জানার অধিকার’ বলে একটি নতুন আইন চালু হয়েছে আমাদের দেশে। এ বছরের অক্টোবর মাসে। খুবই প্রয়োজন ছিল এমন একটি আইনের। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এর গুরুত্ব। চারিদিকে অবহেলা আর অবহেলা। কোনো কাজ ঠিকমতো হয় না। রুটিন কাজ, তবু হয় না। হলেও এলোমেলো ভাবে হয় বা নামেমাত্র হয়। কেন এমন হয়, দেখার কেউ নেই। কেন নেই, জানার উপায় নেই। জানানোরও কেউ নেই। যে কেউ কোনো দিন কিছু জানার জন্য ঘুরেছেন সরকারি দপ্তরে, তিনিই জানেন কী পরিমাণ হয়রান হতে হয় সেখানে। আমরা সব বাইরের লোক। বাইরের লোককে কিছু জানানো যাবে না, এই তাদের অজুহাত। কি সাহেব কি বড়-বাবু বা বয়-বেয়ারা অফিসের সবার এক রা। সরকারি সব তথ্যই নাকি গোপন! আপনাকে-আমাকে জানাতে তারা বাধ্য নয়। এমনটাই তাদের ধারণা বা বিশ্বাস। অথচ এদের হাতেই সঁপে দেওয়া রয়েছে আমাদের ভাল-মন্দের ভার। এরা করলে হবে। না করলে নয়। এর নাম প্রশাসন।

নতুন আইন হয়েছে। এই প্রশাসনকে সচল করার জন্য। স্বচ্ছ করার জন্য। দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য। ওই আইনে বলা আছে প্রতিটি সরকারি, আধা-সরকারি বা সরকারি অনুদানে চলে এমন যে কোনো সংস্থায় বা অফিসে, মানুষ সরাসরি চলে যেতে পারবে। গিয়ে ইনফরমেশন অফিসারের কাছ থেকে যে কোনো নথি বা তথ্য দেখতে, যাচাই করতে, টুকে নিয়ে আসতে পারবে। যেমন যদি কেউ জানতে চায় ওই অফিস আগের মাসে ক’টি গাড়ি ভাড়া করেছে, কার কাছ থেকে করেছে, কে কে সেগুলি ব্যবহার করেছে, কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তার জন্য কত লিটার তেল কেনা হয়েছে, লিটার প্রতি সে-গাড়ি কত মাইল চলেছে, এরকম প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য সেই অফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী। তক্ষুনি না পারলে পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এবং কবে দিতে পারবেন জানাতে হবে। এই আইনটি যখন বলবৎ হল, তখন প্রশাসনের লোকজন কী বলেন বা করেন সেটাই দেখার।

কী করবেন বা কী বলবেন তার ইঙ্গিত অবশ্যি আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। পেয়েছি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। যাদের এই উত্তর দেবার দায় সেই কার্যনির্বাহীরা আপত্তি জানাবার আগেই মুখ্যমন্ত্রী তাদের হয়ে আগ-বাড়িয়ে বলেছেন এভাবে কাজ হয় না। এতে কাজে ব্যাঘাত হবে। আমাদের প্রশ্ন কেন হয় না? কেন কাজের ব্যাঘাত হবে? সরকারি সব হিসেব-পত্র, স্যাংসন-অর্ডার-মেমো, নোট-সারকুলার সবই তো কাগজে কলমে রয়েছে। ফাইল খুলে সেটা দেখাতে অসুবিধেটা কোথায়? আসলে অসুবিধে ইচ্ছেতে।

তবে অসুবিধে হলেও তো করার কিছু নেই। এখন থেকে তা করতে হবে। আইন তাই বলছে। পার্লামেন্টে পাশ হওয়া আইন। প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে এই আইন। এতে কাজে অসুবিধে হবে মনে হলে আইন পাশ হওয়ার আগে পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি সে কথা বলতে পারতেন। বলেন নি তখন। স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করেন বলে বলেননি তা নয়। কারণ গোপনীয়তাই এদের কর্মপদ্ধতির অঙ্গ। তবে পার্লামেন্টে সে কথা বলেননি। বলেননি কারণ তারা ভেবেছেন হোক না আইন চালু। ক্ষতি কি? তাদের তো অসুবিধে নেই। যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই, সেখানে এই আইনের সুবিধে নেবেন। আর যেখানে তারা ক্ষমতায়, সেখানে তো তাদের হাতেই রইল ব্যাপারটা। ‘কী ভাবে’ তা কার্যকর করবেন সেটা তো তারাই ঠিক করবেন। ‘কী ভাবে’ করবেন তার লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই পাচ্ছি। জনগণ যে কোনো অফিসে হাজির হয়ে এটা-সেটা জানতে চাইবেন, তা হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সব প্রশ্ন তার ‘তথ্য মন্ত্রকের’ কাছে করতে হবে। আর তার উত্তর সেই তথ্য মন্ত্রকই দেবে! অথচ এই সুযোগ বিস্তৃত করার জন্য সব অফিস থেকেই তথ্য জানানোর ব্যবস্থা চালু করতে বলা হয়েছে। কী ভাবে আইনটি প্রযুক্ত হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে আইনে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা তার দলের কিছুই বলার থাকার কথা নয়। অথচ ওই আইন কী ভাবে প্রয়োগ হবে তাই নিয়ে সরকারের হয়ে ভাবছেন ওই রাজনৈতিক দল! এজন্যই শঙ্কিত আমরা।

এই আইন পাশ হয়েছে দুহাজার পাঁচ সালের জুন মাসে। নির্দেশ ছিল এর পরের এক’শ কুড়ি দিনের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যকে এটি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই নির্দেশে পরিষ্কার বলা আছে, রাজ্য স্তর থেকে শুরু করে সাব-ডিভিসনাল বা সাব-জেলা স্তর অবধি সমস্ত পাবলিক অথরিটি মানে সরকারি, আধা-সরকারি, সরকারি সহায়তাপুষ্ট সমস্ত অফিসে, প্রতিষ্ঠানে এরজন্য তথ্য আধিকারিক (ইনফরমেশন অফিসার) নিয়োগ করতে হবে। যাতে মানুষ স্থানীয় অফিস থেকেই যা জানার জেনে নিতে পারে। এজন্য বিশেষ একটি মাত্র দপ্তরের ওপরই যাতে নির্ভর না করতে হয়। এজন্য নানান ধরণের অফিস তাদের তথ্যাদি কীভাবে প্রস্তুত করবেন তার নমুনা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাদের এই সময়ের মধ্যে সেই সব ম্যানুয়াল রেডি করে ফেলার কথা। এবং অফিসে অফিসে টাঙিয়ে দেবার কথা। এই খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করারও কথা। কী ভাবে মানুষ এই আইনের সাহায্য নেবেন সে কথা

ইলেকট্রনিক-সহ নানান মাধ্যমে প্রচার করার কথা। নতুবা লোকে জানবে কিভাবে? এই সমস্ত ব্যবস্থা ২০০৫-এর ১৩ অক্টোবরের মধ্যে করে ফেলার কথা ছিল। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত। রাজ্য সরকার এখনও প্রস্তুত নন।

এর থেকে চিরন্তন একটি সত্যের কথা মনে আসে। ক্ষমতার বাইরে থাকা আর ক্ষমতায় থাকার মনস্তত্ত্বে আসমান-জমিন ফারাক। সেই সত্য প্রমাণ হল আর একবার। দুঃখের হলেও এই কথা সত্য যে, এই আইন আগেই চালু করেছিল দেশের অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্য, যেখানে এদের মতো 'প্রগতিশীলেরা' সরকার চালায় না। যেমন তামিলনাড়ু-তে করুণানিধি-সরকার, মধ্যপ্রদেশে দিগ্বিজয় সিং-সরকার ও আরও কয়েকটি সরকার। আর সেই আইনের সুযোগ নিয়ে অনেক মানুষ বহু সরকারি দপ্তরকে বাধ্য করেছে ফেলে-রাখা কাজ শেষ করতে বা কিছু কিছু কারচুপি বন্ধ করতে।

এই আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, সরকারি কাজেকর্মে গোপনীয়তার বেড়াজাল ছিন্ন করে স্বচ্ছতা আনাই এর উদ্দেশ্য। এবং আরও উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রকল্পে ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যাতে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয় তা সুনিশ্চিত করা। আর সরকারি কাজকর্মে জোচ্চুরি, ঢিলেমি, অকর্মণ্যতা রদ করা। সেটা একমাত্র সম্ভব যদি সেই কাজের ওপর নজরদারি করার ভার থাকে সাধারণ মানুষের। এই আইনে সেই বন্দোবস্তই পাকা করতে চাওয়া হয়েছে। এই আইনে তাই বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি বা আধা-সরকারি বা সরকারি অনুদানে চলা সমস্ত কতৃপক্ষের সাব-জেলা-স্তর অবধি অফিসকে প্রকাশ্যে জানাতে হবে কত জন কাজ করে সেই অফিসে বা বিভাগে, কে কী করে, কেমন তাদের মাইনে-পত্র, কী এই বিভাগের কাজ, কী তাদের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা বা প্রকল্প, কত অর্থ এর জন্য বরাদ্দ, কোন অফিসার বা কর্মী কোন প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন, ইত্যাদি। এ-সব সর্বসমক্ষে জানানোর যোগ্য তথ্য। আইনে পরিষ্কার বলা আছে: আদর্শ ব্যবস্থা সেটাই যাতে মানুষের এই আইনের সাহায্য নেবার দরকারই না পড়ে। অর্থাৎ ভাবখানা যেন যা কিছু অফিসিয়াল কাগজপত্র ফাইলে বন্দি করে রাখতে হয়, তার একটি করে কপি আফিসের সামনে টাঙিয়ে রাখতে পারলেই ভাল হয়। যাতে মানুষ চাইলেই দেখতে পারেন। অফিসের কাউকে আর বিরক্ত করতে হয় না এজন্য।

এর পরও যদি কারো কৌতূহল হয় যে রামবাবু কোনো একটা কাজের বরাত না পেয়ে শ্যামবাবু কেন পেল, তখন তিনি গিয়ে অফিসের বড় কর্তাকে সেই ফাইলটা দেখাতে বলতে পারেন, যেখানে -কিসের ভিত্তিতে তিনি কাজের বরাত রামবাবুকে না দিয়ে শ্যামবাবুকে দিয়েছেন, এই মর্মে 'নোট' দিয়েছেন।। এ হল নীচের দিকের অফিস-কাছারির কথা। অন্য দিকে মন্ত্রী-আমলারা দলবল নিয়ে সারা বছর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন ঘুরছেন কেউ জানে না। ঘুরে কী লাভ হল জানতে পারি না। এখন জানতে চাইতে পারব। শিল্পায়নের নামে হাজার হাজার বিঘে জমি তথাকথিত উদ্যোগপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে সরাকার। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই কোনো উদ্যোগের নামগন্ধও দেখা যায় না। এবার থেকে জানতে চাইতে পারব: যাকে দেওয়া হয়েছে, তিনি আসলে কে, আদৌ তিনি কোনো শিল্পপতি কিনা, কত টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে জমি, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর। প্রতিদিন কতশত চুক্তি হচ্ছে শুনছি। কী তাতে লেখা হচ্ছে কেউ জানি না। সরকারের হয়ে একজন কেউ সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেন কী চুক্তি হল। ব্যস্। সত্যাসত্য যাচাই করার উপায় নেই। এখন এই আইনের অধিকারে সরকারি নথির হুবহু নকল দেখতে চাইতে পারব। এসব তথ্য জানতে চাইলে টাকা দিতে হবে এবং এক মাস সময় সময় দিতে হবে। আর, যে তথ্য জানতে চাই তার সাথে যদি জীবনমরণ সমস্যা জড়িত থাকে, তা হলে সেই তথ্য পেতে পারি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে! এমনটাই বলা আছে আইনে।

ভাবছেন এ কোন স্বর্গরাজ্যের গল্প ফাঁদা হয়েছে এই আইনে! কিন্তু হয়েছে। কদ্দুর কার্যকর হবে বা হওয়া সম্ভব এখনই বলা যাচ্ছে না। কাজটা কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। এই আইন দিয়ে দেশে বিপ্লব ঘটে যাবে এমন মনে করারও কারণ নেই। কিন্তু আইনটি যদি অংশতও কার্যকর হয় তাহলেও কিছু সমস্যার সুরাহা হয়। কারণ আজ আমরা নিত্যদিন জীবনযাপনে যেসমস্ত কারণে বিপন্ন বা বিপর্যস্ত হই তার বেশির ভাগই কিন্তু যে যে-কাজের দায়িত্বে আছে সে সেটা না করার কারণে। তা সেটা রাইটার্স হোক কী থানা হোক, হাসপাতাল হোক কী মিউনিসিপালিটি হোক, স্কুল-কলেজ-আদালত হোক কী পঞ্চায়েত হোক, ইনসিওরেন্স অফিস হোক কী বিদ্যুৎ পর্ষদ হোক। করছে না, কারণ না করে পার পেয়ে যাচ্ছে। করছে না কারণ তারা জানে, না করলেও কেউ দেখার নেই।

এই কর্মীবাহিনীর একটা বড় অংশ ভান করেন যেন তারা সাধারণ মানুষদের একজন। তাদেরই মতো অসহায় ক্ষমতাহীন। মোটেই নয়। মোটেই এরা ক্ষমতাহীন আমজনতার মতো নন। সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তারা যদি শহর থেকে দূরে গাঁয়ে-গঞ্জে বসবাস করেন তাহলেও। ওই ক্ষমতায় আর কিছু না হোক নিত্যদিন অফিসে বসে গ্রাম-গঞ্জ-শহরের থেকে আসা সাধারণ মানুষকে হয়রান করা, অপদস্থ করা, বা চাপ দিয়ে তাদের কাছ থেকে দুপয়সা আদায় করে নেওয়া যেতেই পারে। এবং এক অংশ অফিস-কর্মী নির্লজ্জের মতো নিত্যদিন সেটা করেও থাকেন। --থানায়, আদালতে, আয়কর বা বিক্রয়কর ভবনে, রেজিস্ট্রি-অফিসে বা পৌরভবনে, পঞ্চায়েত অফিসে বা রেশন অফিসে এমন যে কোনো অফিসে যেখানে মানুষকে যেতে হয় ঠেকায় পড়ে, সেখানেই এমন করুণ দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের অনেকেরই হয়। প্রশাসন নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আর তার দোসর কন্ট্রাক্টর-দালালদের হাত ধরেই চলছে সমস্ত জোচ্চুরি আর ফাঁকিবাজি। আজ যদি মানুষ কোনোভাবে এই আইনকে হাতিয়ার করে

জোচ্চুরি বন্ধ করার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তাহলে ভয়ে হলেও অন্তত কিছু লোক খানিকটা সংযত হবে। স্বভাব-জোচ্চোর আর ফাঁকিবাজ ছাড়া বাদবাকিরা একটু নড়েচড়ে বসবে আশা করা যায়।

তবে চাইলে আজই সব তথ্য হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন ভাবার কারণ নেই। এর জন্য বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। তথ্যগুলো সংগ্রহ করে বাছাই করে সাজিয়ে পরিবেশনের যোগ্য করে তোলা বেশ ধৈর্য ও পরিশ্রমের কাজ। এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করছে যিনি রাজ্যের চিফ ইনফরমেশন অফিসার পদে নিযুক্ত হচ্ছেন তার সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার ওপর। তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে এই কাজে সকলকে উৎসাহিত করায়। পদমর্যাদা ও মাইনের দিক থেকে ইনি রাজ্যের চিফ ইলেকশন কমিশনারের সমান হবেন। আর এনার পরেই যিনি থাকবেন সেই ইনফরমেশন কমিশনারের মাইনে-পত্র মর্যদা রাজ্যের চিফ-সেক্রেটারির সমান। এদের নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল। এবং নির্বাচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদলনেতা ও একজন কেবিনেট মন্ত্রী-এই তিনজনের একটি কমিটি। বোঝাই যায় পদমর্যদা ও ক্ষমতার দিক থেকে এনাদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের সমকক্ষ করার কথা ভাবা হয়েছে। ফলে চাইলে অনিচ্ছুক ও খামখেয়ালি অফিসারদের সহযোগিতা আদায় করায় অসুবিধে হবে না। আসলে সেই ব্যক্তি নিজে কতটা তাগিদ বোধ করছেন তার ওপরই নির্ভর করছে এর সাফল্য। ফলে ওই পদে একজন যোগ্য ব্যক্তি নির্বচনের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যের কথা এই রাজ্যে সরকারের এজেন্ডা অন্য। এরা চান না এই আইনের সার্থক প্রয়োগ হোক। সব ক্ষেত্রেই এরা 'আওয়ার ম্যান' খোঁজেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। দীর্ঘ সাত মাস ধরে খুঁজেপেতে একজন প্রাক্তন আমলাকে পেয়েছেন। তাকে চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। চাকুরি জীবনে যিনি একসময় মুখ্যমন্ত্রীর সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। খুব বিশ্বস্ত না হলে নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর সহায়ক করা হয় না। তার ওপর ইনি এক সময় রাজ্য সরকারের তথ্য আধিকারিক হিসেবেও কাজ করেছেন। এই পদে থাকা কালীন ইনফরমেশন পরিবেশনের ব্যাপারে তার কেমন রেকর্ড তার কথা গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৫-এর ইংরেজি *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় লিখেছে--'Incidentally, the state government's chosen man had a reputation of not sharing information with the Press when he served as secretary in the information and cultural affairs department and as secretary to the chief minister`. হায়! আর সেই ব্যক্তিকেই বেছে বেছে করা হল চিফ ইনফরমেশন কমিশনার!! চিফ ইনফরমেশন কমিশনার ও ইনফরমেশন কমিশনারের গুণাবলী কেমন হবে সে সম্পর্কে আইনে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সেখানে বলা আছে --'The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.` পশ্চিমবঙ্গে আজ 'এমিনেন্ট' লোকের বড়ই আকাল। যা আছে তা হয় ওই পার্টির অন্দরমহলে অথবা প্রশাসনে!! আইনে বলা আছে, অনধিক দশ জন সদস্য নিয়ে রাজ্য স্তরের ইনফরমেশন কমিশন গঠিত হবে। কিন্তু পাঁচ মাস চেষ্টা চরিত্র করে অবশেষে একজনকে পাওয়া গেছে। ফলে ওই একজনকে নিয়েই গঠিত হল সেই কমিশন। এবং তিনি কী রকম এমিনেন্ট তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি তার পরিচয় তো আগেই দেওয়া হয়েছে।

এই আইনের ফাঁকফোকরও রয়েছে। তথ্য আদৌ পাওয়া যাবে কিনা অবশেষে নির্ভর করছে সেই ইনফরমেশন অফিসারের মর্জির ওপর। তাকে বাধ্য করতে যা করতে হবে তা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। আর চুরি-জোচ্চুরি-ফাঁকিবাজি ধরা পড়লেও তার বিচার কে করবে? এখনও তো অনেক জোচ্চুরির কথা জানাজানি হচ্ছে। কজনের বিচার বা শাস্তি হয়েছে? প্রায় হয়নি বললেই চলে। তবুও এতেই কেউ কেউ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আপত্তি উঠছে নানান প্রান্ত থেকে। আসলে শাস্তি না হলেও জোচ্চুরির ব্যাপারটা জানাজানি হওয়াটাও তো ঝামেলার ব্যাপার। তাই আপত্তি। যেমন সামরিক বিভাগের কর্তারা একেবারেই চান না তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হোক। অথচ কে না জানে চুরি-জোচ্চুরি-কারচুপির ব্যাপারে সামরিক বিভাগের সুখ্যাতির(!) কথা। সেজন্য তাদের দিক থেকে আপত্তি উঠেছে সব থেকে আগে। আর কারচুপি জোচ্চুরি কী কেবল সরকারি আর আধা-সরকারি অফিসেই হয়? প্রাইভেট কোম্পানিতে হয় না? সরকারি অফিসের লোকজন সাধারণ মানুষকে হয়রান করে এবং ঠকায়, আর প্রাইভেট কোম্পানি সাধারণ মানুষকে তো বটেই তার সাথে সরকারকেও ঠকায়। যার জের অবশেষে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই এসে পড়ে। ফলে সেই অসৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা কেন এই আইনের বাইরে থাকবে? তাদের ক্ষেত্রেও এই আইন বলবৎ করতে এই আইনের সংশোধন চেয়ে দাবি তুলতে হবে।

তাই বলছিলাম আইনটি পাশ হয়েছে যখন, তখন এর ব্যবহার করার সুযোগটা আদায় করার চেষ্টা করতে হবে এবং এর পরিধি বিস্তারের দাবি তুলতে হবে। এজন্য জনমত তৈরি করা প্রয়োজন। মানুষের কাছে এই আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা জরুরি। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে হবে তাদের। বিভিন্ন মিডিয়া একাজে উদ্যোগী হতে পারে। এজন্য পাড়ায় পাড়ায় ফোরাম গড়ে তোলা যায়। পাড়ার ক্লাব বা অন্য যে কোনো ধরণের সংগঠন এর প্রচারে এগিয়ে আসতে

পারে। স্কুল কলেজগুলোকে টার্গেট করা যায়। ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এলে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজটা সহজ হবে। তারাই এগিয়ে নিয়ে যাতে পারবে কাজটা।

।। কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য ।।

ইনফরমেশন বা তথ্য বলতে কি বলা হচ্ছে

কী কী বিষয় ইনফরমেশন বলে ধরা হচ্ছে তা বাংলা করে বলার থেকে ইংরেজি শব্দগুলোই বেশি চেনা লাগবে। অফিসিয়াল কাজে ব্যবহৃত শব্দ সেসব। সেই শব্দগুলোই বলছি। রেকর্ডস্, ডকুমেন্টস্, মেমোজ, ই-মেলস্, ওপিনিয়নস্, অ্যাডভাইসেস, প্রেস রিলিজ, সারকুলারস্, অর্ডারস্, লগ-বুকস্, কন্ট্রাক্টস্, রিপোর্টস্, পেপার্স, স্যাম্পেলস্, মডেলস্, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রাখা ডাটা, প্রাইভেট সংস্থার তথ্য যার ওপর সরকারের এক্তিয়ার আছে -- এসবই ইনফরমেশন। অর্থাৎ সরকারি, আধা-সরকারি, সরকারি সাহায্যপুষ্ট যে কোনো অফিস, ব্রাঞ্চ-অফিস, জেলা-অফিস, থানা, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হেলথ্ সেন্টার, পঞ্চায়েত, প্রভৃতি সব জায়গায় নথিপত্রের নামে যা কিছু তৈরি হয়, যা কিছু এ-টেবিলে ও-টেবিলে ঘোরাঘুরি করে এবং তার ওপর নানান কর্তা যা কিছু লেখালেখি করেন তার সব কিছুই তথ্য বা ইনফরমেশন। এসবই আমরা জানতে বা দেখতে বা কপি করে নিতে চাইতে পারি।

কীভাবে এল এই আইন

আসলে আমাদের সংবিধানেই এই অধিকার অন্তর্নিহিত ছিল। সংবিধানের ১৯(১)এ-র ধারায় বাক্স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবেই স্বীকৃত। এই অধিকারের জের হিসেবেই তথ্য জানার অধিকার এসে যায়। বাক্স্বাধীনতা যথাযথ ব্যবহার করার জন্যই এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকার পরিচালনায় মানুষের অংশগ্রহণের জন্য এই অধিকার জরুরি। আর এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য সঠিক তথ্য জানা থাকা দরকার। অনুমানের উপর ভিত্তি করে বাক্স্বাধীনতা ব্যবহার মানেই অযথা সংশয় বা মিথ্যা-রটনা সুযোগ রাখা। অনেকেই এই অধিকার সম্পর্কিত স্পষ্ট একটি আইনের কথা বলছিলেন অনেক দিন ধরে। এই সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট উক্তি আছে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ম্যাথুজের। তিনি ১৯৭৫ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার ভার্সাস রাজনারায়ণের একটি মামলার রায়ে বলেছিলেন: ‘The people of the country have right to know every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing. ...But the legislative wing of the state did not respond to it by enacting suitable legislation for protecting the right of the people`. এর পরে ১৯৮২ সালে সুপ্রিম কোর্টে এস. পি. গুপ্তা ভার্সাস ভারত সরকারের একটি মামলায় সরকার পক্ষ গোপনীয়তার অজুহাতে কিছু তথ্য দেখাতে অস্বীকার করলে বিচারক ফের এই অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন যে, সরকারের জানা উচিত আমাদের সংবিধানে তথ্য জানার অধিকার আলাদা ভাবে দেওয়া না থাকলেও বাক-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের মধ্যেই এই অধিকার অন্তর্নিহিত।

১৯৮৯ সালে শ্রী ভি. পি. সিং প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে তিনি এমন একটি আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন এবং ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার এই মর্মে একটি আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯৬ সালে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই সম্পর্কিত একটি বিলের খস্ড়া তৈরি করে। এর পর হায়দ্রাবাদের ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট-ও অনুরূপ একটি খস্ড়া তৈরি করে। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের ওপর এগুলি বিবেচনার দায়িত্ব দেন। ২০০০ সালের জুলাই মাসে পার্লামেন্টে এই বিল আলোচনার জন্য আসে। এরপর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এই বছরের জুন মাসে এটি আইন হিসেবে গৃহীত হয় এবং অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখ থেকে এই আইনের প্রয়োগ শুরু হওয়ার কথা।

তথ্য জানার অধিকার নিয়ে প্রথম আন্দোলন

তথ্য জানার অধিকারের দাবি জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে রাজস্থানের এক প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন। এই দাবি প্রথম তুলেছিলেন ভীম-তহ্শিলের মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন (এম.কে.এস.এস.)। ওই অঞ্চলে উন্নয়নের নামে স্কুল-বাড়ি, ডিসপেনসারি, বাঁধ, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ হচ্ছিল। কিন্তু মানুষ দেখছিল স্কুল-বাড়ির ছাদ নেই, ডিসপেনসারির দেওয়াল নেই, বাঁধের কাজ অসম্পূর্ণ, কমিউনিটি সেন্টারের জানালা-দরজা নেই। এই ধরণের জোচ্চুরি দেখে ওই সংগঠনের লোকজন স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ওইসব কাজের বিল, ভাউচার, নির্মাণ-কাজে নিয়োজিত কর্মীদের মাস্টার-রোল, কনট্রাক্টরের নাম, ইত্যাদি দেখানোর দাবি তোলে। ওই অফিস প্রথম প্রথম এদের পাত্তা দেয়নি। হটিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু এরা ছেড়ে দেয়নি। সারা বছর ধরে লেগে ছিল। অবশেষে কিছু তথ্য ওরা আদায় করেছে। কাগজপত্রের জেরক্স

পেয়েছে। এবং আবিষ্কার করেছে নানান দুর্নীতি ও কারচুপির নিদর্শন। যেমন লেবারারদের মাস্টার রোলে যে সমস্ত কর্মীর নাম রয়েছে তার অনেকেরই অস্তিত্ব নেই অথবা অনেকদিন আগেই মারা গেছে।

এই সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই এম.কে.এস.এস.-এর পক্ষ থেকে জন-শুনানির আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য স্থানীয় প্রশাসনে জোচ্চুরি ও দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করা এবং এই কাজে লিপ্ত লোকজনদের চিহ্নিত করা। তাতে স্থানীয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারি অফিসার, কর্মী, রাজনৈতিক নেতা, সবাইকে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ 'বিশিষ্ট লোকজন'ই এর থেকে দূরে থাকেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে এরা এমন বেশ কয়েকটি জন-শুনানির আয়োজন করেন। তেমনি একটি শুনানিতে জনরোষ এত তীব্র আকার নেয় যে, একজন স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার একজন কৃষকের কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে নেওয়া পনেরো হাজার টাকা সর্বসমক্ষে ফেরৎ দিতে বাধ্য হন।

কীভাবে পাওয়া যাবে তথ্য

প্রথমে পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা সংক্ষেপে পি. আই. ও.-র খোঁজ করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের অফিসে এই পি. আই. ও. অথবা এ. পি. আই. ও. নিযুক্ত হওয়ার কথা। এই অফিসারের কাছেই লিখিত আবেদন করতে হবে। কী তথ্য চান জানাতে হবে। কী ভাবে, মানে জেরক্স চান, নাকি ফ্লপিতে কপি চান সেটা জানাবেন। তবে কেন এই তথ্য আপনি চান তা জানানোর দরকার নেই। আবেদন পত্রের সাথে ফি হিসেবে দশ টাকা জমা দিতে হবে। জেরক্স কপির জন্য পাতা প্রতি দু'টাকা লাগবে। তবে বড় কাগজে জেরক্স হলে আরও বেশি লাগবে। ফ্লপি ডিস্কে কপি চাইলে ডিসকেট-প্রতি পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তবে নথিপত্র শুধু দেখবার জন্য কোনো ফি লাগবে না। এই দেখার কাজে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগলে ঘন্টা-প্রতি পাঁচ টাকা লাগবে। তবে দারিদ্র্য সীমার নীচে আছেন এমন কাউকে তথ্য জানার জন্য কোনো ফি দিতে হবে না। আবেদন করার এক মাসের মধ্যে আপনি সেই তথ্য পাবেন। সে তথ্য যদি না দেওয়া যায় তাহলে কেন দেওয়া যাবে না আপনাকে জানানো হবে। জবাবে সন্তুষ্টো না হলে স্টেট চিফ ইনফরমেশন অফিসারের কাছে আবেদন করতে পারবেন। এই আইনের বয়ান দেখতে চাইলে নীচের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে পারেন।

www.persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.html

কাদের তথ্য এবং কোন কোন বিষয়ের তথ্য পাবেন না

আই.বি., আর.এ.ডব্লু.(র), রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স, সেন্ট্রাল ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, এনফোর্সমেন্ট, নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো, এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার, স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, বি.এস.এফ., সি.আর.পি.এফ., সি.আই.এস.এফ., এন.এস.জি., আসাম রাইফেলস, সি.আই.ডি., আন্দামান ও নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ-পুলিস, ইত্যাদি মোট আঠেরোটি দপ্তর বা বিভাগকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা সম্পর্কে তথ্য নাও মিলতে পারে। যেমন, যদি তাতে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি বিষয়টি স্ট্র্যাটেজিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আইনে-এ আটকায় এমন বিষয়, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে এমন বিষয়, বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়, বিদেশ থেকে পাওয়া তথ্য যার ওপর বাধানিষেধ আছে, কোর্টের বিধিনিষেধ আছে এমন বিষয়, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যহত হয় এমন বিষয়, অপরাধ বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ বিঘ্নিত হতে পারে এমন বিষয়, কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন সংশয় হতে পারে এমন বিষয়, ক্যাবিনেট-পেপার এবং ক্যাবিনেট-মিটিং-এ আলোচনার বিবরণ এবং কপিরাইট সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘিত হয় এমন বিষয়।

তবে এসব ক্ষেত্রেও তথ্য মিলতে পারে যদি দেখা যায় জনস্বার্থের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর ওপরে বলা আইনের আওতার বাইরের বিভাগগুলিতেও যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বা জোচ্চুরির ঘটনা ঘটে তবে সে সম্পর্কে খবরাখবর জানার আধিকার থাকছেই।

কোন কোন রাজ্যে এ আইন আগে থেকেই ছিল

নব্বই-এর দশক থেকেই কিছু কিছু রাজ্যে নানান ভাবে এ আইন চালু হয়েছিল। তবে সে সব আইন খুব সুলিখিত বা খুব ব্যাপক ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল এমন নয়। তামিলনাডু এবং রাজস্থানে এ আইন ১৯৯৬ সাল থেকেই সীমিত আকারে চালু হয়। পরে অন্যান্য রাজ্যেও চালু হয় । যেমন, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাত, কেরল।

এই আইন জনপ্রিয় করতে একটি উদ্যোগ

পরিবর্তন নামের একটি সংস্থা *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা*-র সাথে একযোগে একটা ফোরাম গঠন করেছে। তারা এই আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লোককে অবহিত করার কাজ করছেন। কী ভাবে এই আইন ব্যবহার করতে হবে জানাতে ক্যাম্প করছেন। সবার কাছে তাদের ডাক হল 'Tell Them You Know`--about your Right to

Information। পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি আলাদা কলাম থাকছে। লোকজনের অভিজ্ঞতার কথা লেখা হচ্ছে তাতে। কী বিষয়ে আবেদন করেছেন, ফলাফল কিছু হচ্ছে কিনা সেসব খবর থাকছে। যেমন দিল্লির একজন লিখছেন, তিনি দিল্লি করপোরেশন-এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে চোদ্দোটা প্রশ্ন রেখেছিলেন। জবাবে সেখানকার অফিসার বলেছিলেন তিনি দুটোর বেশি প্রশ্নের জবাব দেবেন না। তারপর ওই ভদ্রলোক এই আইনের কপি বার করে দেখিয়ে দিতে বলেন কোথায় বলা আছে দুটির বেশি প্রশ্ন করা যাবে না। অফিসার ভদ্রলোককে মানতে হয়েছে যে, তেমন কোনো বাধা নিষেধ নেই। স্বীকার করেছেন যে, সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। দিল্লি মিউনিসিপ্যালিটি ইতিমধ্যেই শত শত প্রশ্নবাণে জর্জরিত। তারা জানিয়েছেন আগামী দিনে তাদের সব তথ্য যাতে অন-লাইনে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এমন অনেক খবর এক্সপ্রেসের ওই কলামে দেখতে পাবেন। http://expressindia.com/initiatives/rti/
E-mail: indianexpress@parivartan.com

<u>মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত</u>

এমন একটি আইন ২০০২ সালেই চালু হয়েছিল ওই রাজ্যে। সৌভাগ্যের কথা অ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে এবার এই আইন প্রয়োগের পূর্বে প্রাথমিক প্রস্তুতির ভার পড়েছিল যে ভদ্রমহিলার ওপর, তিনি প্রবল উৎসাহে কাজে লেগে যান এবং নানান বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁর কাজের উৎসাহ দেখে মুম্বাই-এর একজন অ্যাক্টিভিস্টের মন্তব্য হল ইনি হলেন --'...one among the brightest faces in drab old Mantranalaya`. এই ভদ্রমহিলা স্বীকার করেছেন যে, সরকারি অফিসের লোকজনের হেফাজতে থাকা তথ্য বার করা খুবই শক্ত। কিন্তু ইনি বিশ্বাস করেন, এই আইনের যথাযথ ব্যবহার হলে '..empowerment of people`-এর লক্ষ্যে বেশ খানিকটা এগুনো সম্ভব হবে। এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পলিটিশিয়ানদের মতামতের কোনো জায়গা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। যেমন এখন কোনো মন্ত্রী যদি সরকারি জমি বা সম্পত্তি ন্যায্য দামের কমে কাউকে উপঢৌকন হিসেবে দেন, তাহলে তার এই মর্মে দেওয়া ফাইলের নোট-টা যে কেউ চাইলে দেখে যাচাই করে নিতে পারবেন। এই অফিসারের নাম বন্দনা কৃষ্ণা। ইনি 'নিউজ লাইন'-এ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এইসব কথা বলেছিলেন।

<u>পৃথিবীর অন্য যে সব দেশে এই আইন স্বীকৃত</u>

পৃথিবীর অনেক দেশেই এই আইন বলবৎ রয়েছে। যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান-দেশগুলোয়, মালয়েশিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ইত্যাদি দেশে। তবে সব দেশে এই আইনের ব্যাপ্তি সমান আকারের নয়। কোনো কোনো দেশে এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধানিষেধ এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

।। আসুন আমরা প্রয়োজনে এই আইনের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হই ।।

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৫

‘প্রযুক্তি’র ভারত ও ‘তথ্যপ্রযুক্তি’র ভারত --কোন পথে ?

অমিত চৌধুরী

ভারত আবার জগত সভায় .....

গত শতকের আশির দশক থেকে এদেশে সরকারি স্তরে কমপিউটার নিয়ে ‘হইচই’ শুরু । নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে --কমপিউটার-প্রযুক্তি ও কমুনিকেশন-প্রযুক্তির যোগফলে --এক নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এল এক নতুন ‘বাস্তবতা’। এই ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে সারা দেশ জুড়ে যে ব্যস্ততা চলছে --তারই পাশাপাশি ‘প্রযুক্তিভিত্তিক আশাবাদের’ এক স্বপ্নময় আবহ তৈরি করা হচ্ছে । বলা হচ্ছে, প্রযুক্তিচর্চার সাফল্যে জগত সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্তি আর দূর-অস্ত্ নয় ! তথ্যসমাজ থেকে গড়ে উঠবে জ্ঞানসমাজ। ভবিষ্যতের জ্ঞানসমাজে নেতৃত্ব দেবে ভারত ! দীর্ঘকালীন পশ্চাদ্পদতা ও পরনির্ভরশীলতায় নুয়ে থাকা আমাদের প্রিয় দেশ সুখসমৃদ্ধি, সাফল্য-উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করছে, এটা শুনলে ভাবলে আবেগে আনন্দে ভাসতে ইচ্ছে করে । নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে সরকারি পরিকল্পনা পর্যালোচনাগুলি যা আজকাল নানান ‘ভিশন’, ‘রোড-ম্যাপ’ জাতীয় ডকুমেন্ট বা রিপোর্ট হিসেবে এখনে ওখানে আলোচিত হচ্ছে । প্রযুক্তিভিত্তিক এই জাতীয় আশাবাদের একজন অতি সক্রিয় প্রচারক আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম । তাঁর *ভিশন ২০২০* বইটি নব্বই দশকের শেষে প্রকাশিত ।

মহাকাশ গবেষণা থেকে যুদ্ধ গবেষণার প্রজেক্ট করতে করতে কালাম সাহেবের কল্পনায় ভাবনায় ভারতের সমাজ সভ্যতার সামগ্রিক জটিলতা কত সহজেই সমাধা হয়ে যায় সরকারি প্রযুক্তি প্রজেক্টের প্রস্তাব-লক্ষ্য-বাজেটের মতো গতানুগতিক ‘অক্ষর-সমষ্টি’তে যেখানে না আছে কোনো গভীর বিশ্লেষণ, না আছে কোনো নতুনতর দার্শনিক বা সৃজনশীল পথনির্দেশ ! *ভিশন ২০২০* বইটি আসলে সরকারি ধাঁচেই তৈরি ‘টাইফ্যাক’ (TIFAC or Technology Information Forecasting & Assessment) নামক প্রযুক্তি পরিকল্পনার জড়ো করা তথ্য বা উপাদানের ওপর ভিত্তি করে লেখা । ড. আবুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা থাকাকালীন যজ্ঞস্বামী সুন্দর রাজনের সঙ্গে যৌথভাবে বইটি লেখেন । তাঁরা বলছেন, ভারতের প্রথম ভিশন ছিল ‘স্বাধীনতা’। সাতচল্লিশ সালের পর থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে একঘেয়ে সুরে শুনে আসছি ভারত ‘উন্নয়নশীল’ বা ডেভেলপিং দেশ । এ আর ভল্লাগে না ! এবার হতে হবে ‘উন্নত’ বা ‘ডেভেলপ্ড’ ! শুধু উন্নত নয়, ২০২০ সালে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে উন্নতির নিরিখে চতুর্থ স্থানে উঠে আসার পথটাই --(দ্বিতীয় ভিশন) নাকি দেখিয়ে দিয়েছেন আবদুল কলাম ও সুন্দর রাজন । প্রশ্ন হল, আমরা কি পথটা আদৌ চিনতে পারছি ?

২০২০ সালের উন্নত অবস্থানে পৌছতে যে যে ঘটনাগুলো ঘটবে বলে বলা হয়েছে ঐ বইতে তার কয়েকটা হল গ্রামীণ অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ও গবেষণা-আত্মীকরণের বিপ্লব খনিজ-সম্পর্কিত শিল্প, বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক্স শিল্প, ওষুধ শিল্প, যানবাহন শিল্প ও জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্প (সফ্টওয়্যার, মিডিয়া, আর্থিক পরিষেবা) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ক্রমাগতই বেড়ে চলা দেশীয় বাজার স্ব-রোজগারের (self-employment) বৃদ্ধির ঝোঁক ইত্যাদিতে । লক্ষ্যে পৌছতে যেভাবে জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়বে বলা হয়েছে তা হল, ২০০২-০৬ তে ৮%, ২০০৭-১১ তে ১০% ও ২০১২-২০ তে ১৩% ! স্বাক্ষরতার হার ১৯৯১-এর ৫২% থেকে ২০২০ তে দাঁড়াবে ৮০% ! এত বড় উচ্চাকাঙ্খী ভিশনকে বাস্তবে পরিণত করতে শুধুমাত্র সকলের শুভবোধেই ভরসা করেছেন কালাম ও রাজন। ত্যাগী, সৎ সাধারণ মানুষ বা পুণ্যাত্মা, সৎ সরকারি অফিসার বা পুণ্যাধিকারী ও সৎ নেতা বা পুণ্য নেতা --এই তিন ধরণের মানুষের সম্মেলনে গড়ে তুলতে চান তাঁরা । অবশ্য এর মধ্যে পুণ্যনেতাদের তাঁরা এখনও খুঁজছেন ! এছাড়া কয়েক পৃষ্ঠায় সরকারি-বেসরকারি, ছোট বড় সংস্থা ও সরকারের কর্তব্যকর্ম কিছু মোটা দাগের বাক্য সমষ্টিতে সূত্রায়ন করেছেন তাঁরা, যার মূল কথা হল সবাইকে আরো বেশি করে, আরো তাড়াতাড়ি, আরো ভালভাবে কাজ করতে হবে। হতাশা কাটিয়ে উঠতে হবে, প্রয়োজনে নতুন পথে এগোতে হবে। সমস্যাভিত্তিক কোনো পর্যালোচনা নয়, সংস্কারমূলক কোনো বিস্তৃত বা গভীর পরিকল্পনা নয়, সামাজিক কোনো নতুন উদ্যোগের রূপরেখা নয় --শুধু ওপর ওপর কিছু ভালো ভালো কথা শুনিয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বৌদ্ধিক ব্যবস্থার মধ্যেই গতানুগতিক চলনে-বলনে একবিংশ শতাব্দীর ভারতে দেশোদ্ধারের এই ‘ভিশন’ দেশগঠন নিয়ে আগেকার বা অন্য সব এই জাতের ‘ভাঁড়ামি’র থেকে যে একটা ব্যাপারে নতুন তা হল এর অতিরিক্ত প্রযুক্তিকেন্দ্রিক প্রস্তাবনা বা আলোচনা । আসলে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে শ্রমসম্পদ ও মেধা-সম্পদের পুনর্বন্টন বা পুনর্বিন্যাসের যে বহুজাতিক কর্মকাণ্ড চলছে সেখানে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির প্রশ্নগুলো গুলিয়ে দিয়ে নতুন ধরণের কর্মধারা সৃষ্টির জন্য এক ধরণের প্রযুক্তি-সর্বস্বতার সংস্কৃতি চর্চা করা হচ্ছে । প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের কিছু কাল্পনিক বা মোহময় মডেল তৈরি করে অনগ্রসরতা, অভাব,

শ্রম-শোষণের কঠোর বাস্তবতাকে চাপা দিয়ে রাখাই এর উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রপতি কালামের ভিশন বইটি এই চরিত্রের চর্চারই একটি উদাহরণ যা আমাদের স্বপ্ন দেখাতে গিয়ে, পথ চেনাতে গিয়ে আসলে বিভ্রান্তই করে ।

এই ধরণের 'স্বপ্নময়' বিভ্রান্তির আরো একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ ভারতের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার সর্বময় কর্তা বা ডাইরেক্টর জেনেরেল রঘুনাথ মাশেলকারের একটি সাম্প্রতিক লেখা । লেখাটির নাম 'ভারতীয় গবেষণা-- সর্বোচ্চ সাফল্যের পথে' (India's R&D: Reaching for the Top)। কয়েক বছর আগে ভারতীয় কংগ্রেসে পাঁচ হাজার বিজ্ঞানীর সমাবেশে তিনি বলেন, 'একবিংশ শতাব্দী হবে ভারতের শতাব্দী । ভারত হয়ে উঠবে এক অনন্য বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যাকে সবাই সমঝে চলবে ।' মাশেলকার মহাশয়ের স্বপ্ন হচ্ছে ."...to create a global knowledge pool for global good through global funding" (একটি বিশ্বজনীন জ্ঞানের উৎস যা বিশ্বের ভালো করবে বিশ্বের আর্থিক সহায়তায়)। বহুজাতিক বা বিদেশী সংস্থা জ্ঞান ভিত্তিক কাজকর্ম বা গবেষণাগার ভারতে বসাতে উৎসাহ দেখানোয় অত্যন্ত খুশি মাশেলকার মহাশয় ! বিগত পাঁচ বছরে আই.বি.এম., ইনটেল, মটোরোলা সহ প্রায় এক'শ এই ধরণের সংস্থা ভারতে গবেষণাকেন্দ্র চালু করেছে । এই সংস্থাগুলির অনেকেরই গবেষণা বাজেট ভারতের মোট গবেষণা বাজেটের (ছয় বিলিয়ন ডলার) থেকেও বেশি । এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাশেলকার মহাশয় অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন আমাদের দেশে গবেষক-প্রতি জ্ঞান উৎপাদনের খরচ সবচেয়ে কম । আর একেই তিনি বলেছেন 'সাফল্য' ! এই সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর । বহুজাতিক অর্থে তিনি গড়তে চান 'সস্তা মেধার' উন্নত ভারত ! এই শ্রেষ্ঠত্বেরই সাধনা কি আমরাও চাই ? 'প্রযুক্তির' ভারতে উন্নয়ন মানে কি তবে শুধু বিদেশী সংস্থার জন্য সস্তার মানব সম্পদের যোগান ?

কালাম সাহেব বা মাশেলকার মহাশয় যতই অলীক বা উদ্ভট স্বপ্ন দেখান সাম্প্রতিক কালেই ইউ এন ডি পি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাফল্যের যে মাপকাঠি তৈরি করেছে তার নিরিখে পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট বড় দেশের ক্রমতালিকায় (২০০১ সালের) ভারতের স্থান তেষট্টিতম ! এই মাপকাঠিটি চার দিক থেকে আট রকমের নির্দেশকের মান ধরে সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ হিসেবে করা হয়েছে। চারটি দিক হল প্রযুক্তি সৃজন, নতুন উদ্ভাবনের পরিব্যপ্তি, পুরনো উদ্ভাবনের পরিব্যপ্তি ও মানবিক দক্ষতা । প্রযুক্তি সৃজনের মান মাপা হয় মাথাপিছু পেটেন্টের সংখ্যা, রয়্যালটি ও লাইসেন্স ফি বাবদ প্রাপ্ত ডলার মিলিয়ে । এছাড়া মাপা হয় ইন্টারনেট ও টেলিফোনের ব্যবহার, মোট রপ্তানি করা সামগ্রীতে উচ্চ ও মধ্য স্তরের প্রযুক্তির অংশ, শক্তির ব্যবহার ও শিক্ষা বা বিজ্ঞান শিক্ষার হার । বোঝাই যাচ্ছে স্বপ্নবিলাসী নেতাদের আন্দাজ নয়, এখানে প্রযুক্তিগত মাপকাঠিটি বেশ সার্বিকভাবেই তৈরি করা হয়েছে । তেষট্টিতম স্থান থেকে কোন ম্যাজিকে ২০২০ সালে ভারত অর্থনৈতিক বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠে প্রথম পাঁচটি উন্নত দেশের একজন হয়ে উঠবে জানি না । তবে প্রযুক্তি নিয়ে 'ভারতীয় সাফল্যের' এইসব কল্পকথার কেন্দ্রে যে তথ্য-প্রযুক্তির কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কিছু আলোচনা এখানে করতে চাই ।

জনগণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি ?

ইদানিং আমাদের দেশে বড় বড় আন্তর্জাতিক বা জাতীয় কনফারেন্স ও সামিট সংগঠিত করে 'ডিজিটাল ডিভাইড'কে নির্মূল করা বা 'তথ্য-সমাজ' বা 'জ্ঞান-সমাজ' গড়ে তোলা নিয়ে জোরদার প্রস্তুতি বা প্রস্তাব নেওয়াটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নিয়মিত ব্যাপার । অশিক্ষা, অভাব, অনগ্রসরতা দূর করতে জনগণের জন্য চালু হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক বেশ কিছু প্রজেক্ট, ঘোষণা করা হয়েছে 'আই টি ফর মাস' বা 'জনগণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি' বিষয়ক সরকারি পলিসি ডকুমেন্ট । কমপিউটার ভিত্তিক তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যত্রতত্র টাচ্‌স্ক্রিন কিয়স্ক, ওয়েব ইন্টারনেট ও ওয়্যারলেস প্রযুক্তির ওপর ভর করে । সর্বজন-বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় কমপিউটার ব্যবহারের জন্য সরকারি বেসরকারি সর্বস্তরেই গবেষণা ও প্রস্তুতি চলছে । এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্যে চালু হওয়া 'জনগণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি' প্রজেক্টের কিছু নমুনা দেখা যাক ।

তামিলনাড়ুতে রূপায়িত হয়েছে STAR (Simplified and Transparent Administration of Registration) প্রজেক্ট । এখানে www.tnregisnet.net নামক পোর্টালের (portal) সাহায্যে নাগরিকদের খুব সহজে সব ধরণের রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তকরণের কাজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বাড়ির ট্যাক্স সোসাইটির বিভিন্ন আদান-প্রদান ইত্যাদি নথিভুক্তকরণ শুরুতে চেন্নাই শহরের তেত্রিশটি কিয়স্ক থেকে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । কেরলের FRIENDS (Fast Reliable, Instant, Efficient, Network for Disbursement of Services) প্রজেক্টের পরিধি উপযোগিতা আরো ব্যাপক । সব জেলা সদরে বিস্তৃত এক ধরণের কমপিউটার ভিত্তিক কাউন্টার থেকেই সপ্তাহের সাত দিনই বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোন, মোটর-ভিহিক্‌ল, রেভিনিউ ইত্যাদি সরকারি দপ্তরের বা সংস্থার সব রকমের ব্যবহারিক তথ্য যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনই পাওয়া যাচ্ছে টাকা জমা দেওয়ার

সুবিধা । হিমাচল প্রদেশের লোকমিত্র বা (LOKAMITRA) হামিরপুর জেলায় ই-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে । ওয়েবভিত্তিক সরকার-নাগরিক ইন্টারফেস এই প্রজেক্টের মূল বৈশিষ্ট । এই ইন্টারফেস সাহায্য করছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে, তথ্য জানতে, ফর্ম পেতে, এমন কী লেনদেনের গ্রামীণ বাজার গড়ে তুলতে । অন্ধ্রপ্রদেশের ই-সেবা বা (e-SEVA)প্রজেক্ট সব আঞ্চলিক শহরে ২৫০টি সার্ভিস সেন্টার মারফত বিস্তৃত। এখানে সরাসরি কমপিউটার কাউন্টারে জমা দেওয়া যায় নানাবিধ সরকারি ট্যাক্স, বিদ্যুতের বিল, দূরপাল্লার বাসের সিট সংরক্ষণ, বা পুনর্ণবীকরণ করা যায় বিভিন্ন লাইসেন্স বা পারমিট । ১৯৯৯সালে চালু হওয়া এই ব্যবস্থায় এখন মাসে কুড়ি লক্ষ নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছেন বা নিচ্ছেন । বহু আলোচিত একটি সফল প্রজেক্ট হল আই টি সি কোম্পানির ই-চপল প্রজেক্ট । জুন ২০০৪ অবধি এই প্রজেক্ট মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের চব্বিশ হাজার গ্রামে পঁচিশ লক্ষ চাষির কাছে পৌঁছে দিয়েছে ইন্টারনেট-ভিত্তিক পরিষেবা । দালালি-জনিত অপচয়-ক্ষতি এড়িয়ে শস্যের সঠিক দর পাওয়া বা বাজার যাচাইয়ের সুযোগ করে দিচ্ছে চাষিদের এই তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক অনলাইন ব্যবস্থা । কেরালাতে শতকরা একশ ভাগ কমপিউটার সাক্ষরতার লক্ষ্যে চালু হয়েছে ই-শিক্ষার ব্যবস্থা অক্ষয়-প্রজেক্টের মাধ্যমে । এখানে আঞ্চলিক ভাষা মালায়ালামে চালানো হচ্ছে সফটওয়্যার । স্বামিনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন তামিলনাড়ুর দশটি গ্রামে মৎস্যচাষি ও গ্রামীণ মানুষদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান-কেন্দ্র চালু করেছে । এখানে স্যাটেলাইট-ভিত্তিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছে কমপিউটার ও ইন্টারনেট চালাতে । রাজস্থানের গ্রামদূত প্রজেক্ট সারা জয়পুর জেলাকে তিন হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ফাইবার অপটিক লাইন দিয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত করেছে। চার'শর বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এই নেটওয়ার্কে যুক্ত। প্রত্যেক কিয়স্ক চালাচ্ছে এক এক জন গ্রামদূত । এই গ্রামদূত ব্যবস্থা ইশাসন, ই-সেবা, ই-শিক্ষার ব্যবস্থার সম্মেলন । আই আই টি বোম্বাই অন্য কয়েকটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে শুরু করেছে RASI (Rural Access to Services through Internet) প্রজেক্ট, যা মাদুরাই-এর বিভিন্ন গ্রামে (প্রায় ১০০ সেন্টারে) পরিচালিত হচ্ছে আঞ্চলিক এন জি ও-র সাহায্যে । মধ্যপ্রেদেশের আদিবাসী জেলা ধারে চলছে জ্ঞানদূত প্রজেক্ট । এখানে পাঁচটি ব্লকে কুড়িটি গ্রাম-কেন্দ্র নেটওয়ার্কভুক্ত করে সরকার-নাগরিক সরাসরি কমপিউটার-ভিত্তিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আঞ্চলিক জন উদ্যোগেই । ৮০০ গ্রামকে এর আওতাভুক্ত করার কথা আছে । কেন্দ্রীয় সরকারের এন আই সি-র উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যে তথ্য-কিয়স্ক (Information Kiosk) বসিয়েছে বিস্তৃতভাবে নানান সুবিধা বন্টনের জন্য । এন আই সি-র আরেকটি এই ধরণের প্রজেক্ট হল কর্ণাটকের ১৭৭টি তালুকের জন্য কন্নড় ভাষায় চালিত সফটওয়্যার-ভিত্তিক জমি রেকর্ড ও রেভিনিউ ব্যবস্থা চালু করার জন্য ভূমি প্রজেক্ট । এন আই সি (NIC or National Information Center)-র ই-পঞ্চায়েত প্রজেক্ট অন্ধ্রপ্রদেশের মেডাক, ভাইজাগ, পূর্ব গোদাবরী, নালগোণ্ডা ও অনন্তপুর জেলার বেশ কিছু গ্রামে রূপায়িত হয়েছে ।

আই আই এম আমদাবাদ ই-শাসনের পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট রূপায়িত করেছে উত্তর গুজরাটের পাঁচমহল জেলায় যেখানে নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । জল, রেশন কার্ড, পেনশন, অভিযোগ, বিল জমা ইত্যাদি বিষয়ে সহজ কমপিউটার-ভিত্তিক আদান-প্রদান এই প্রজেক্টের ফল । দেশজুড়ে এই ধরণের ছোট বড় উদ্যোগের পাশাপাশি সম্প্রতি খুব তোড়জোড় করে জাতীয় ই-শাসন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে । এর মোট বাজেট চোদ্দ হাজার কোটি টাকা ! কুড়িটি কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, তিরিশটি রাজ্য বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, ৩৬০ টি রাজ্য সরকারি দপ্তর, ৫০০ রূপায়ণকারী সংস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত । হায়দরাবাদে গড়ে তোলা হয়েছে National Institute of Smart Governance (NISG) বা স্মার্ট শাসনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান । দেশজুড়ে ই-শাসন প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সক্রিয় । এটা বোঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বা কাজকর্মে যে আধুনিকীকরণ বা কমপিউটারাইজেশনের জোয়ার এসেছিল দশ বছর আগে তারই আরেক পর্ব শুরু হয়েছে ই-শাসনের দেশজোড়া কর্মকাণ্ডে । কোটি কোটি টাকা খরচ করে কমপিউটার বসিয়ে সফটওয়্যার তৈরি করে, নেটওয়ার্কযুক্ত করে যে ই-শাসন প্রজেকটগুলো দপ্তরে দপ্তরে রূপায়িত হয়েছে তার সার্বিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয়কারী সংস্থা বা ভেণ্ডর যেভাবে বুঝিয়েছে সেভাবেই খরচা হয়েছে রাশি রাশি সরকারি টাকা । অসংখ্য শিক্ষিত কর্মচারী, অফিসার, আমলা-রা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ সরকারি দপ্তরের কমপিউটার-ভিত্তিক উন্নয়নে সেই জ্ঞান-সম্পদ যথোপযুক্ত সক্রিয় বা সচেতন নয় । ফলত, গতানুগতিক রূপায়ণ, অবহেলিত ব্যবস্থাপনা, আনাড়ি ব্যবহার ও অবৈজ্ঞানিক রক্ষণাবেক্ষণ -- সরকারি ই-ব্যবস্থার এটাই সাধারণ চিত্র ! অজ্ঞ, নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজকে জড়িয়ে ই-শাসনের বিপুল ও ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডগুলি কি তাহলে সফল হবে ? নাকি এখানেও চলবে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় দিশি-বিদেশী নানান সংস্থার চটকদারি বাক্যজালের আড়ালে নতুনতর প্রহসন ! আলোচিত প্রজেক্টগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জনগণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বলতে এখানে সরকারের সাথে আরো ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থাই মূলত ভাবা হয়েছে। অর্থাৎ যদি এই উদ্যোগগুলি পাইলট স্তর থেকে শেষ অব্দি সামগ্রিক রূপায়ণে উন্নীত হয়, যদি যথোপযুক্ত অর্থ, প্রযুক্তি ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সফল হয় প্রকল্পের কাজকর্ম --তাহলে আরো একটু আধুনিক কায়দায় শাসিত হতে পারবেন দেশের

জনগণ । তাতেই কি দূর হবে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অভাব, আনগ্রসরতা ? প্রশ্ন হল, ই-শাসনের পরিধিতে আটকে না থেকে কেন আমরা ভাবব না, গ্রাম-ভারতকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষার ব্যাপক রূপায়ণের কথা ? আমার তো মনে হয়, তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ এক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনারই সৃষ্টি করেছে । অনেক দেশই তাই ই-স্বাস্থ্য বা ই-শিক্ষার প্রয়োগে অনেকদূর এগিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাহলে কি করব ?

ই-শাসন না ই-স্বাস্থ্য ?

প্রযুক্তির ভারত বা তথ্যপ্রযুক্তির ভারত কোন পথে, কী ভাবে গড়ে উঠবে আর তার ফলাফল কী দাঁড়াবে এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করার ফাঁকে দেশের সাম্প্রতিক সামাজিক অবস্থার কিছু তথ্য একটু দেখে নেওয়া যাক । সেনসাসের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে ৭৩% ভারতীয় গ্রামে বাস করেন। ৬০% কর্ম-শক্তি অসংগঠিত বা কৃষিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত । সব চেয়ে গরিব মানুষের ৭৫% বাস করেন ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে । গ্রামীণ জনগণের ২৯% দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন । BPL (বি পি এল) সংখ্যাটা হচ্ছে প্রায় ২০ কোটি । শহুরে মানুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা ২৩.৬% মানে মোটামুটি ৬ কোটি । স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রটা একটু দেখা যাক । গ্রামীণ মানুষের গরিব ৬০% ভোগ করেন স্বাস্থ্য খাতে খরচের ৩০% এবং ধনী ৪০% ভোগ করেন ৭০% । আরো আশঙ্কাজনক একটি তথ্য হল এই যে, গ্রাম ভারতে ঋণের বোঝা চেপে বসার দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল স্বাস্থ্য বা অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত ব্যয় ! আর্থিক ও ভৌগোলিক বা অন্যান্য কারণগুলির জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গরিব মানুষদের অবস্থা এদেশে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে আছে --সেক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার ও উপযুক্ত প্রচলন আমাদের মতো বড় এবং গরিব দেশে খুবই প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে । স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে বিশেষ ধরণের তথ্য, জ্ঞান, বিশ্লেষণ, তদারকি, নজরদারি লাগে ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তার খরচ অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে । উপযুক্ত সফ্টওয়্যারের সাহায্যে । বিস্তৃত ভূখণ্ডে বা দূরবর্তী গ্রাম সমাজে উন্নত যোগাযোগ-প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে পারে এই সব তথ্য, জ্ঞান, ইত্যাদি । রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইটের কল্যাণে এক ধরণের বিনোদন ব্যবস্থা যেমন দুর্গম স্থানের অধিবাসী বা অতি গরিব মানুষের কাছেও সহজলভ্য হয়েছে --কমপিউটার-ইন্টারনেট-সফ্টওয়্যারের সাহায্যে ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও কিছু ব্যাপারে অন্তত সেরকম কিছু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে । অবশ্য ওষুধপত্র বা অপারেশন ইত্যাদির খরচ থেকেই যাবে । যা কমানোর জন্য বিশেষ গ্রামীণ ইনসিওরেন্স ব্যবস্থার কথা কেউ কেউ ভাবছেন ।

উন্নত প্রযুক্তির প্রসার যেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ খরচ সাপেক্ষ, সরকারি ই-শাসন পরিকল্পনায় হাজার হাজার টাকা খরচের আগে ভাল করে ভাবা উচিত ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠনে গুরুত্ব প্রদানের কথা ।

ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে সাধারণ ভাবে যে সুবিধাগুলি বোঝায় তা হল:

১. স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা পোর্টাল ব্যবহার।

২. রোগী-ডাক্তার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে ইন্টারনেট-ভিত্তিক 'যখন খুশি যেখানে খুশি' (Anywhere-anytime) যোগাযোগ ।

৩. রোগীর স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য বা নথিপত্র বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষণ (Electronic Medical Record or EMR)।

৪. বয়স্ক ব্যক্তি বা ক্রনিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ঘরে বসে পার্সোনাল কমপিউটারে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সহায়তা ।

৫. টেলি-মেডিসিন বা দূর চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ।

৬. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজকর্ম, টাকাপয়সা, ওষুধপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট ইত্যাদি আদানপ্রদান ব্যবস্থা ।

৭. ওষুধের প্রতিক্রিয়া, অ্যালার্জি, চিকিৎসা সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক্স্পার্ট সিস্টেম জাতীয় সফ্টওয়্যারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা ।

৮. জনস্বাস্থ্য বা কমিউনিটি হেল্থ্ বিষয়ে নিয়মিত অঞ্চল-ভিত্তিক অনলাইন নজরদারি ও তদারকি ।

৯. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপাদানগুলির মধ্যে কমপিউটার-কম্যুনিকেশন ভিত্তিক সঠিক সমন্বয় রক্ষা ।

১০. দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়-জনিত রোগ-অসুখ-বিপদের জরুরি মোকাবিলা ।

১১. অনলাইন চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশাদারি শিক্ষা ।

১২. সার্জারি সংক্রান্ত জটিল অবস্থার মোকাবিলায় সিমিউলেটেড বা ভারচুয়াল ব্যবস্থা ।

১৩. জ্ঞান বিতরণের ওয়েব-ব্যবস্থা বা ওয়েব-কাস্টিং ।

১৪. বায়োমেডিক্যাল তথ্য ও গবেষণায় ইন্টারনেট ব্যবহার ।

১৫. বায়োমেডিক্যাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় ইন্টারনেট ভিত্তিক আদানপ্রদান।

একটু আশার কথা এই যে, দেরিতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর টেলিমেডিসিন নিয়ে প্রস্তুতিমূলক একটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে । চিকিৎসা ও প্রযুক্তি জগতের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ও সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে "Standards for Telemedicine System in India" এবং "The framework for IT infrastructure for health" নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ পলিসি দলিল রচনা করা হয়েছে । এটা ঠিক যে, ভারতের মতো বড় দেশের বিভিন্ন স্তরের ও ধরণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে একেবারে নতুন ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগুতে গেলে সকলের আস্থা আর্জন করতে হবে এবং আইনি, প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলিকে যথাসম্ভব আগে থেকে অনুধাবন করতে হবে । তাত্ত্বিক এই প্রস্তুতির পাশাপাশি ব্যবহারিক পদক্ষেপ বা পাইলট প্রজেক্টের সংখ্যা বা বিস্তৃতি কিন্তু আদৌ আশানুরূপ নয় । বিশেষত, কোটি কোটি গ্রামীণ গরিব মানুষের কথা ভেবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ই-স্বাস্থ্যের কাঠামোগত প্রস্তুতি খুবই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে । ই-শাসন নিয়ে বহুবিধ ব্যস্ততার পাশাপাশি ই-স্বাস্থ্য নিয়ে সরকারের সীমাবদ্ধ প্রস্তুতি বেশ দৃষ্টিকটু । এদেশে টেলিমেডিসিনের কিছু উদ্যোগে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (AIIMS), চন্ডীগড়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট (PGI) ইত্যাদি কিছু সরকারি হাসপাতাল যুক্ত থাকলেও, তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কাজ করেছে একমাত্র বেসরকারি অ্যাপোলো হাসপাতালের নেটওয়ার্ক । এঁরা বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৪৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার বসিয়েছে, যার একটি হল সুদূর নাগাল্যান্ড-এর কোহিমায় । এছাড়া গুজরাতের একটি প্রযুক্তি সংস্থা যার নাম অনলাইন টেলিমেডিসিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বেশ কিছু প্রজেক্ট রূপায়ণ করে গুরুত্ব অর্জন করেছে এদেশের টেলিমেডিসিনের ক্ষেত্রে । এছাড়া, ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) টেলিমেডিসিনের ব্যাপারে এগিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে একটি বিশেষ ধরণের টেলিমেডিসিন স্যাটেলাইট শীগ্‌গিরই ছাড়া হবে ।

আসলে ভারতীয় চিকিৎসাবিদদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যবহার করতে --চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে ও সস্তা-মেধার বিষয়টিকে মাথায় রেখে পুনর্গঠিত বিশ্ববাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ভারতকে ভবিষ্যতের গবেষণার 'হাব' হিসেবে ভাবার মতো, ভবিষ্যতের চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য 'ডেস্টিনেশন' হিসেবে গড়ে তোলারও একটি প্রস্তুতি চলছে মূলত বড় বড় স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থে। বড়লোকী চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নয়নে এই এলিট ই-স্বাস্থ্য কাঠামো কিন্তু দেশের কোটি কোটি অসহায়, অনগ্রসর গ্রামীণ জনগণের খুব একটা কাজে লাগবে না। তাই, অন্যতর উদ্যোগ নিতে হবে নিচুতলার মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে বিস্তৃত করে তুলতে হবে, মদত দিতে হবে দেশীয় সংস্থার প্রযুক্তিগঠন বা সফ্‌টওয়্যার রচনাকে । ব্যবহার করতে হবে কম খরচের জি আই এস (GIS or Geographical Information System) ব্যবস্থা, হ্যান্ডহেল্ড কমপিউটার বা সিমপিউটার (Simputer an Indian hand-held computer), ফ্রি সফ্‌টওয়্যার বা (WLL or Wireless in local loop) প্রযুক্তি --যেখানে যতদূর সম্ভব। গড়ে তুলতে হবে প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসাবিদ ও সাধারণ মানুষের যৌথ সামাজিক উদ্যোগ --যেখানে গুরুত্ব পাবে আলঙ্কারিক বা অপচয়ধর্মী প্রযুক্তি সর্বস্বতার মানসিকতার বদলে প্রয়োজন-ভিত্তিক ও স্বনির্ভর পথে প্রযুক্তির গ্রহণ-বর্জন-ব্যবহার। কল্পনার প্রযুক্তিসর্বস্ব শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্খী ভারতের বদলে তখন গড়ে উঠবে সত্যিকারের বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ সংস্কৃতির ব্যবস্থাসহ 'সবার মুখে হাসি ফোটানো' এবং শান্ত সুন্দর ভারত যেখানে গ্রাম ও শহর হাঁটবে ভবিষ্যতের পথে হাতে হাত রেখে ।

তথ্যসূত্র:

১. এ পি জে আব্দুল কালাম ও ওয়াই এস রাজন, *ভারত ২০২০ -নতুন শতাব্দীর জন্য একটি ভিশন,* ভাইকিং, পেঙ্গুইন বুক্‌স্ ইন্ডিয়া, ১৯৯৮ ।

২. রঘুনাথ এ মাশেলকার, 'India's R&D: Reaching for the Top`, *সায়েন্স,* ভলিউম ৩০৭, ইস্যু ৫৭১৪, পৃ.১৪১৫-১৭, ৪ মার্চ, ২০০৫ ।

৩. www.censusindia.net -ওয়েবসাইট ।

৪. A. U. Jay Ganesh, "Health drivers, Applications, Challenges ahead and Strategies: A conceptual Framework", *Journal of Indian Association for Medical Informatics.*

৫। Prof. Petes Yelloelees, "Trends in e-health -Technological Advances that will impact on diagnosis and treatment", Center for Online Health, University of Queensland.

সাইবার অপরাধ : সাম্প্রতিক হালচাল
সায়নদীপ সরকার

আজ থেকে বছর দশেক আগে যে ঘটনাগুলির শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানের গল্পে উল্লেখ পাওয়া যেত, তা যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে কেউ ভাবে নি। বলা হয় --"Science is a good servant but a bad master" । এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আপনি কমপিউটারের সাহায্যে টিকিট কাটতে পারেন, বাজার করতে পারেন, খাবার আনতে পারেন, ব্যাঙ্কে টাকা জমা-তোলা ইত্যাদিও করতে পারেন। তবে প্রযুক্তির বলে বলীয়ান অপরাধীরা এই virtual- গন্ডি টপকে এসব ধরণের কাজে কখনও ব্যাঘাত ঘটাবে না এমনটাও আর ভাবা যাচ্ছে না। এইসব অদৃশ্য অপরাধীরা একটি বোতাম টিপে আপনার সারা জীবনের সঞ্চয়, আপনার মূল্যবান তথ্য এমনকী আপনার পরিচয় পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে পারে। এ-কোনোই কল্পবিজ্ঞানের প্লট নয়, বরং সাবধান না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের জন্য এরকমই কোনো ভয়ানক পরিস্থিতি অপেক্ষা করে আছে। আধুনিক প্রযুক্তির জালে বিচরণকারী ওই সব বিষাক্ত জীবদের নিরাপদ দূরত্ব থেকে বরং একবার একঝলক পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া যাক।

ভাইরাস (virus)

কমপিউটার ভাইরাস যে আদপে কী তা নিয়ে অনেক মানুষের মনে এখনো যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই virus-এর পরিপ্রেক্ষিতগত নাম Vital Information Resource Under Seige। আপনার কমপিউটারের ক্ষতি করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নষ্ট করা, কমপিউটারের কাজের গতিকে শ্লথ করা, কারণে-অকারণে কমপিউটার বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি নষ্টামিতে এর জুড়ি নেই। ভাইরাস আসলে কোনো অভিজ্ঞ প্রোগ্রামারের লেখা কোড। এই কোড আপনার মেশিনের মেমরির মধ্যে লুকিয়ে থাকে ও সময়মতো গোলযোগ বাঁধায়। জীবাণুমাত্রই সংক্রামক। কমপিউটার ভাইরাসও এর ব্যতিক্রম নয়। নেট (Net) কিংবা ই-মেল বা সিডি (CD) থেকে প্রায়শই এই সংক্রমণ ঘটে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে ভাইরাল ফিভারে কষ্ট পেলেও ইলেকট্রনিক জগতে রেহাই মিলবে। কারণ এজন্য আছে অ্যান্টি-ভাইরাস (Anti-Virus)। অ্যান্টি-ভাইরাস আসলে একটি বড় সফ্টওয়্যার। এর মধ্যে একটি ভাইরাসের ডিকশনারি থাকে। ডিকশনারির মধ্যে পরিচিত কিছু ভাইরাসের নাম ও কুকর্মের পদ্ধতি বলা থাকে। আপনার মেশিনে সেরকম সন্দেহজনক কাজকর্মের হদিস পেলেই তাকে আটকে দেয় এই অ্যান্টি-ভাইরাস। কিন্তু ভাইরাস প্রোগ্রাম যারা লেখেন তাদের উদ্যমে কখনো ভাটা পড়ে না। নিত্যই নতুন নতুন ভাইরাস লেখা হয়। আর নতুন এই সব জটিল রোগের প্রতিষেধক অ্যান্টি-ভাইরাস সবসময় আপনার নাও থাকতে পারে। তবে উপায়? উপায় হল মাঝে মধ্যে নেট-এ কানেক্ট করে আপনার ডিকশনারি আপডেট করিয়ে নেওয়া, যাতে আপনার মেশিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও নতুন ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে আপনি রক্ষা পেতে পারেন। তবে কখনই আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কারণ অ্যান্টি-ভাইরাস কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। অ্যান্টি-ভাইরাস সফ্টওয়্যারটি নিজে ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ভাইরাসেরও আবার অনেক রকমফের আছে। Boot-Sector ভাইরাস সরাসরি আঘাত হানে মেশিন চালু হওয়ার উপর। ফলে আপনার কমপিউটার চালু (বুট-আপ) নাও হতে পারে। আছে পলিমরফিক (polymorphic) বা বহুরূপী ভাইরাস যারা অ্যান্টি-ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য নানান রূপ ধারণ করে। এছাড়াও রয়েছে stealth-virus । আপনার মেশিনের মেমরিতে একে খুঁজে পাওয়া ভার। নিজেকে লুকিয়ে রেখে কুকর্ম চালিয়ে যেতে এর জুড়ি নেই।

ভাইরাস সত্যিই সমস্যার বিষয়। কারণ ভাইরাস-প্রোগ্রামারদের ও অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রামারদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ঠান্ডা যুদ্ধ প্রতিনিয়ত চলছে। আজ একটা ভাল প্রতিষেধক আবিষ্কার হল তো কালকে তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আরেকটি ভাইরাস লেখা হল। সাধারণ ব্যবহারকারীদের এইসব জেনে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়াটা সত্যিই কঠিন। এই পরিস্থিতিতে লাভবান একমাত্র অ্যান্টি-ভাইরাস-এর কোম্পানিগুলি। তাদের তৈরি সফ্টওয়্যার বেচে এরা প্রচুর মুনাফা লুটছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের আঙুল উঠেছে। তারা নাকি হেঁসেলে হাঁড়ি চড়ানোর জন্য ভাইরাস তৈরি করে নিজেরাই বাজারে ছাড়ছে।

ওয়ার্ম (Worm)

ওয়ার্ম ভাইরাসেরই প্রকারভেদ। কিন্তু ছড়ায় একমাত্র নেট-এর মাধ্যমেই। দ্রুত বহু লক্ষ কমপিউটারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মাঝে মাঝে এগুলি মহামারির আকার ধারণ করে। ভাইরাস সাধারণ যা ক্ষতি করে তার উপরেও এটি নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক-

কে অনেক শ্লথ করে দেয়। এর কাজ মোটামুটি এইরকম -- প্রথমত, ই-মেল-ই এর বংশ বিস্তারের মুখ্য হাতিয়ার। কারুর ই-মেল এলে তার অ্যাড্রেস-বুক-এ রাখা সমস্ত ঠিকানাতেই এটি নিজের একটি কপি পাঠিয়ে দেয়। এবং সেই সব হতভাগ্যদের থেকে অন্যদের ঠিকানায় ছড়িয়ে পড়ে। এরকম ভাবে মেলের মাধ্যমে বংশ-জালিকা বিস্তার করে সারা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করে।
ভাইরাস ও ওয়ার্মের থেকে বাঁচতে একটি মাত্র পন্থাই উল্লেখযোগ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোনো অজানা প্রোগ্রাম রান না করছেন (অর্থাৎ চালাচ্ছেন) ততক্ষণ সেটি আপনার মেশিনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং অজানা কোনো উটকো প্রোগ্রামে হাত না দেওয়াই ভাল।

ট্রোজান হর্স (Trojan Horse)

ভাইরাস বা ওয়ার্মের থেকেও অনেক বেশি ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে ট্রোজান হর্স (Trojan Horse)। ধরুন আপনি নেট-থেকে গান শোনার জন্য একটি সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করলেন। সেটির সাহায্যে সত্যিই গান শোনা যায়, কিন্তু তার এই সাধারণ কাজ ছাড়াও আপনার অগোচরে যে কি করে চলেছে তার সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এটি যদি একটা ট্রোজান হয় তবে সেটি আপনার মেশিনে একটি ব্যাকডোর (back door) তৈরি করবে। সেই ব্যাকডোর-এর মাধ্যমে এই ট্রোজানের প্রোগ্রামার আপনার মেশিনের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। আপনি যখন নেট-এ কানেক্ট করবেন তখন হাজার মাইল দূরে বসে থেকেও সে আপনার মেশিনে নানান অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে পারে। যেমন হঠাৎ আপনার মেশিন বন্ধ হয়ে গেল, রি-স্টার্ট হল, মনিটর অফ হয়ে গেল, ইত্যাদি উপদ্রব ঘটতে পারে। কিন্তু এগুলি নেহাতই ছেলেমানুষি। আরও ক্ষতি হতে পারে যদি সে আপনার মেশিনে একটা stealth key-logger বসিয়ে দেয় (key অর্থাৎ কি-বোর্ডের চাবিগুলি, logger-অর্থাৎ রেকর্ড রাখা)। আপনি মেশিন চলাকালীন যে কোনো বোতামই টিপে থাকুন না কেন, তার সমস্ত রেকর্ড থাকবে এর কাছে। অথচ এই প্রোগ্রামটিকে আপনি খুঁজলেও পাবেন না, কারণ এটা আপনার থেকে লুকনো (stealth) থাকে। আপনার করা এবং পড়া সমস্ত ই-মেল, আপনার ই-মেলের পাসওয়ার্ড, আপনার ক্রেডিট কার্ডের পিন নম্বর, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য এটি মেল করে পাঠিয়ে দেবে এর প্রভুর কাছে। এর চেয়েও বেশি ক্ষতি সম্ভব। হয়তো সেই ট্রোজানের প্রভুটি কোনো সাইবার কুকর্মে লিপ্ত। আপনার মেশিনে যদি তার অধিকার থাকে তাহলে আপনার মেশিনটিকে সে কুকর্মের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতেই পারে। সহজ বাংলায় আপনার ঘাড়ে নলটি রেখে সে বন্দুক ছুড়ে যাবে। আপনি নিরূপায় কারণ সবই ঘটে চলেছে আপনার আগোচরে। এর পরে চলুন সাইবার জগতে অপরাধের চেহারাটা কী রকম একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

স্প্যামিং (Spamming)

এর কাজ হল অজাচিত ই-মেল পাঠানো। স্প্যামারদের কাছে কোটি কোটি ই-মেল অ্যাড্রেস থাকতে পারে। আর থাকে একটি শক্তিশালী প্রোগ্রাম যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাখ লাখ ই-মেল পাঠাতে সক্ষম। নিছক তামাশা বা কোনো বিজ্ঞাপন বার্তা বয়ে আনতে পারে এই স্প্যাম ই-মেল। কিন্তু মেলের বক্তব্য নিয়ে সাধারণভাবে আপনার মাথাব্যাথা থাকবে না, থাকবে সংখ্যা নিয়ে কারণ আপনার সীমিত ক্ষমতার মেল-বক্স থেকে রাশি রাশি মেল মুছে ফেলতে আপনি নাজেহাল হয়ে যাবেন।

স্পুফিং (Spoofing)

এর অর্থ নাম ও ঠিকানা ভাঁড়ানো। আপনি একদিন মেল পেলেন আপনার ক্রেডিট কার্ড সংস্থা বা আপনার ব্যাঙ্ক কোনো কারণে আপনার গোপন পিন নম্বর ও পাসওয়ার্ডটি চেয়ে পাঠিয়েছে। আপনি দেখলেন মেলটি ঠিক জায়গা থেকেই এসেছে। আপনি কর্তব্য পালন করলেন ও সর্বস্বান্ত হলেন। কারণ মেলটি ভুয়ো। এমন মেল তৈরি করাই যেতে পারে যাতে সাধারণ মানুষ আসলের থেকে আলাদা না করতে পেরে ফাঁদে পা দেবেন। একে বলে মেল-স্পুফিং।
ইন্টারনেটের যে কোনো দুটি কমপিউটার তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। তাই প্রত্যেকটি কমপিউটারের একটি স্বতন্ত্র অ্যাড্রেস (address) থাকে যাকে বলে আইপি-অ্যাড্রেস (Internet Protocol address) যা দিয়ে প্রত্যেকটি মেশিনকে আলাদা করে চেনা যায়। মুশকিলটা হল যে এই আইপি অ্যাড্রেস-ও ভাঁড়ানো যায়। আপনি আপনার গুরণত্বপূর্ণ তথ্য যাকে দিচ্ছেন বলে ভবছেন সে কিন্তু আপনার অভীষ্ট লোক নাও হতে পারে।

Online Banking ও transaction-এর সাথে যুক্ত সংস্থাগুলিও কিন্তু নিশ্চুপ বসে নেই। আপনার নিরাপত্তা নিয়ে এরাও চিন্তিত। অনেক রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা এঁরাও করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম data encryption. Encryption-এর অর্থ তথ্যকে এমন একটা রূপে পরিবর্তন করা যাতে তার কোনো মানে দাঁড়ায় না। সাধারণ লোক সেটি পড়ে কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না। অথচ কী করে encryption করা হয়েছে জেনে নিয়ে আসল লোক সহজেই অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন। এ ছাড়াও SSL (Secure Socket Layer), Digital Certificate, Digital Signature ইত্যাদি অনেক প্রযুক্তি দিয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের লেনদেনকে নিরাপদ করার চেষ্টা চলছে। এগুলি দিয়ে মোটামুটি কাজও চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র এটা কখনই জোর দিয়ে বলা যাবে না। আপনি যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তখন অনেক জোড়া চোখ আপনার গতিবিধির ওপর নজরদারি বা পাহারাদারি চালায়। চলুন এদের সম্পর্কে একটু জেনে বুঝে নেওয়া যাক।

কারনিভোর (Carnivor)

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI এর পোষ্য এই মাংশাসী প্রাণিটি লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার ISP (Internet Service Provider)-এর কমপিউটারে। ISP হল, যে সংস্থার মাধ্যমে আপনি নেট-এ কানেক্ট করেন (যেমন BSNL, Sify) ও যার মাধ্যমে আপনের নেট-ভ্রমণের যাবতীয় তথ্যাদি যাতায়াত করে। Carnivor (আসলে একটি সফ্টওয়্যার) একটি ফিল্টারের মতো কাজ করে। ধরে নিন আপনি একে দুটি কথা শিখিয়ে দিলেন -যেমন 'বোমা' ও 'লাদেন'। এরকম অনেক কথা এ নিজর অভিধানে ধরে রেখে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। সাধারণ সব তথ্যকেই এ নিজের মধ্যে দিয়ে পাস (pass) করতে দেয়, কিন্তু মাংসের গন্ধ পেলেই (অর্থাৎ বোমা বা লাদেন কথাটি তার চক্ষুগোচর হলেই) সেই বিশেষ তথ্যগুলি কার কাছ থেকে এসেছে, কাকে পাঠানো হচ্ছে এরকম বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজের কাছে নথিভুক্ত করে রাখে। একটি ISP-র মধ্য দিয়ে পাস (pass) করা সমস্ত মেল (mail), চ্যাটিং (chatting), সার্ফিং (surfing)-এর তথ্যের ওপর Carnivor নজর রাখে। বিশেষ কোনো বা কয়েকটি কমপিউটারের ওপর নজর রাখতেও একে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Carnivor আসলে একটি packet sniffing device । Internet-এ যাতায়াতের সুবিধার জন্য তথ্যকে কিছু data packet-এ ভাগ করা হয়ে থাকে। Carnivore-এর কাজ হল প্যাকেটগুলিকে স্নিফ করা, মানে শুঁকে দেখা। সন্দেহজনক কিছু পেলেই (যেমন বোমা বা লাদেন ধরণের শব্দ) প্যাকেটটির সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেকর্ড করে রাখা। আর পুরো প্রোগ্রামটি একটি network isolation device-এর ঘেরাটোপে থাকে, যাতে অন্য কোনো কমপিউটার এর অস্তিত্ব না টের পায়।

ম্যাজিক ল্যানটার্ন (Magic Lantern)

প্রযুক্তি এগিয়ে গেলে অপরাধীরা নিশ্চয়ই পিছিয়ে থাকবে না। তাদের কুকর্ম গোপন করতে তারাও data encryption ব্যবহার করবে। তাহলে তাদের ধরতে FBI কি করবে? তারা magic lantern প্রয়োগ করবে। এটা অনেকটা এইভাবে কাজ করে-- FBI প্রথমে সন্দেহজনক ব্যক্তির কমপিউটারে hack করে তাতে একটি key logger বসিয়ে দেবে। সেই কি-লগার plaintext (data encryption-এর আগে সাধারণ তথ্য) ও ciphertext (encryption-এর পরে অর্থহীন তথ্য) দুটিই রেকর্ড করে রাখে ও মেল করে পাঠিয়ে দেয়। এই দুটি বিচার করে encryption-এর key (যে পদ্ধতিতে encryption করা হয়েছে) পেয়ে গেলে FBI-এর গোয়েন্দরা অর্থহীন ciphertext থেকে আসল plaintext-টি উদ্ধার করতে পারেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, carnivore ও magic lantern দুটির প্রয়োগই EPA (Electronic Privacy Act)-এর আওতায় পড়ে। যে কোনো সাধারণ নাগরিককে যথেষ্ট সন্দেহ ছাড়া ও কোর্টের অনুমোদন ছাড়া নজর রাখা যায় না। বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশে ওসবের বালাই নেই। একটি cyber crime cell সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে।

আপনি হয়তো জানেন না আপনার কমপিউটারে একটি key logger আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেকর্ড রাখছে। কোনো trojan আপনার মেশিনের দখল নিয়েছে। কোনো packet sniffer সমস্ত packet-এর উপর নজর রাখছে, বা কোনো virus আপনার তথ্যগুলিকে নষ্ট করছে। তাই সাবধানের মার নেই আর এই দুনিয়ায় মারেরও সাবধান নেই।

বক্স ১

এসেলন (Echelon)

এটি একটি পৃথিবীজোড়া network যা সমস্ত স্যাটেলাইট, ফাইবার ওপটিক্স, মাইক্রো-ওয়েভ, সেলুলার ফোনের তথ্য 'intercept' করতে সক্ষম। এই সংস্থাটি কিন্তু আদপেই হাল আমলের নয়। 'UK-USA Agreement 1947'-অনুযায়ী আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে গোপন চুক্তি সাক্ষরিত হয়, যা কিনা দুদেশের মধ্যে intelligence-এর আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করে। ক্রমে কমনওয়েলথ দেশগুলি যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আরও পরে নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, তুরস্ক এই চুক্তিতে 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে সই করে। এই সমস্ত দেশে স্থাপন করা হয় interception base stations । যে কোনো ধরণের data এরা আটক বা intercept করতে পারে এবং বিশ্লেষণও করতে পারে। ধরুন আপনার ওপরে নজরদারি চলছে। ওদের কাছে স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য ফোন কলের মধ্যে একটি voice recognition system চালিয়ে আপনার ফোন কলটিকে চিহ্নিত (identify) করতে পারে। বা প্রচুর ই-মেলের মধ্যে থেকে আপনি যেগুলি করছেন তাও আলাদা করা সম্ভব। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তি ছাড়াও এরা কোনো সংস্থার ওপরও নজরদারি চালাতে পারে। শোনা যায়, আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা করে দিতেও নাকি এর ব্যবহার হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'commercial espionage'।

বক্স ২

www.heavens-above.com

এটি একটি চমকপ্রদ ওয়েবসাইট। সাধারণত এখানে ভ্রমণকারীদের মধ্যে নক্ষত্রপ্রেমীদেরই ভিড় বেশি। পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সেখানকার রাতের আকাশের তারামণ্ডলী কেমন দেখাবে তা বলে দেয়। কিন্তু চমক এখানে নয়। যে কোনো জায়গা থেকে (কোনো বিশেষ latitude এবং longitude) থেকে পর পর সাত দিন কোন্ কোন্ স্যাটেলাইট পাস (pass) করবে তারও আগাম হদিশ মেলে। এর data base-এ আছে অসংখ্য satellite। বলা হয় এর মধ্যে বেশ কিছু নাকি spy-satellite হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি দৈনিকে পড়েছিলাম আফগানিস্তানে তালিবান উচ্ছেদের সময় তালিবানরা নাকি ওই ওয়েবসাইট দেখে স্যাটেলাইটগুলির গতিবিধি জেনে, তাদের আসা যাওয়ার সময় নির্ধারণ করত। এভাবেই তারা মার্কিনী স্যাটেলাইটের কোপ এড়াতে পারত। মার্কিনী প্রযুক্তি তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার এটি এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

জার্মানির পরমাণু বোমা প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক
প্রদীপ কুমার দত্ত

পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষেত্রে জার্মানির কিছু সুবিধা ছিল । সে সময় পৃথিবীর সেরা কয়েক জন বিজ্ঞানী ছিলেন জার্মান। আকরিক ইউরেনিয়াম সংগ্রহেও তাদের বিশেষ সমস্যা হত না । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দেখা গেল বোমা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে নি। মিত্রশক্তিও তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইওরোপে যুদ্ধ শেষ । দশ জন জার্মান বিজ্ঞানীকে মিত্রশক্তি ব্রিটেনের ফার্ম হল-এ বন্দি করে রাখে । মিত্রশক্তির বিজ্ঞানীরা এবং গোয়েন্দা বিভাগ মনে করতেন যে, হাইজেনবার্গের মগজ-ই বোমা তৈরির পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। জার্মানি ইউরেনিয়াম গবেষণায় কতটা এগিয়েছিল তা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে 'আলসোস'-এর বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । তাঁদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানকার প্রতিটি ঘরে গোপন মাইক্রোফোন বসানো ছিল। সেই রেকর্ড-করা কথোপোকথনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হত রিপোর্ট । ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারেরা সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাতেন। এভাবে তৈরি ২৭০ পৃষ্ঠার গোপন ফার্ম-হল রিপোর্টের ফাইল ঐতিহাসিকদের পরম আগ্রহের বিষয় । ১৯৪৭ সালে গাউডস্মিট-এর লেখা বই *আলসোস*-এ ওই ফাইলের ইঙ্গিত ছিল। ডাচ পদার্থবিদ গাউডস্মিট ছিলেন আলসোস মিশন-এর অধিকর্তা । ম্যানহাটন প্রকল্পের অধিকর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভস ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তার *নাউ ইট ক্যান বি টোল্ড* বইয়েও এই ফাইল ব্যবহার করেছিলেন । কিন্তু তারপরও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাতচল্লিশ বছর ধরে তা নিষিদ্ধ করে রেখেছিল । ১৯৯২ সালে পদার্থবিদ নিকোলাস কুর্তির উদ্যোগে এই ফাইল প্রকাশের জন্য প্রচার শুরু হয় । ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্জিনে গাউডস্মিটের পেন্সিল নোট সহ ফার্ম-হল রিপোর্টের মার্কিন কপি প্রকাশিত হয় । এই রিপোর্ট থেকেই জার্মান বোমা কর্মসূচি সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্য জানা যায় ।

জার্মানিতে বিজ্ঞানী হিসেবে হাইজেনবার্গের মর্যাদা ছিল অতুলনীয় । জার্মানির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব স্পিয়ারের কথায়: ১৯৪২ সালের জুন মাসে বার্লিনে এক মিটিং-এ বোমা তৈরিতে জার্মানির প্রযুক্তিগত অক্ষমতা নিয়ে হাইজেনবার্গের সন্দেহই বোমা নিয়ে তাদের আশায় জল ঢেলে দেয় । যুদ্ধকালীন জটিল আর্থিক অবস্থায় বোমা বানানো যে সম্ভব নয় হাইজেনবার্গের এই ধারণাই জার্মানির বোমা তৈরি করতে না পারার কারণ।

১৯৪২ সালে হাইজেনবার্গ বোমা তৈরির সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পিয়ার ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের কেন নৈরাশ্যবাদী কথা বলেছিলেন সেটা একটা রহস্য । হাইজেনবার্গ কি আন্তরিকভাবে তার মতামত দিয়েছিলেন, নাকি বোমা তৈরি সম্বন্ধে সরকারি আশার বেলুন চুপসে দিয়েছিলেন ইচ্ছে করে ? ফার্ম-হল রিপোর্ট থেকে এসব প্রশ্নের উত্তরের আভাস মেলে । বিজ্ঞানীরা ঘরে লাগিয়ে রাখা গোপন মাইক্রোফোনের কথা জানতেন না। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন, কাউকে খুশি করতে নয়। ৬ জুলাই কার্ট ডিনবার্গ বলেন, জানি না এখানে হয়তো মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে । হাইজেনবার্গ হাসতে হাসতে জবাব দেন, --মাইক্রোফোন বসানো আছে? আরে, না । এরা এতটা করবে না। এরা গেস্টাপো পদ্ধতি জানে বলে মনে হয় না । এ ব্যাপারে এরা কিছুটা সেকেলে ।

১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট বেতারে পরমাণু বোমায় জাপানের হিরোশিমা শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সংবাদে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । জার্মান পরমাণু বোমার প্রধান তাত্ত্বিক হাইজেনবার্গ প্রথমে মনে করেছিলেন এটা ভুয়ো খবর । পরে বিস্তারিত খবর শুনে তাঁরা এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন । তারপর নিজেদের কর্মসূচির কী ভুলত্রুটি ছিল তা নিয়ে কথাবার্তা চালান। এখানে বলা দরকার আলোচ্য প্রসঙ্গে ৬ অগাস্ট সন্ধ্যা ছ'টার বিবিসি-র ঘোষণার পর থেকে ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত, অর্থাৎ যেদিন বোমার পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়টি হাইজেনবার্গ সমবেত বন্ধুদের বুঝিয়ে বলেন সেদিন পর্যন্ত, রেকর্ড করা অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

৬ অগাস্ট সন্ধ্যায় বাকি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে অটো হান বললেন, আমেরিকানরা যদি ইউরেনিয়াম বোমা বানিয়ে থাকে তাহলে আপনারা সবাই দ্বিতীয় স্তরের বিজ্ঞানী হয়ে গেলেন। বেচারা বৃদ্ধ হাইজেনবার্গ ! পরমাণু বোমা নিক্ষেপের নৈতিকতার প্রশ্ন যখন এল হাইজেনবার্গের ঘনিষ্ঠ কার্ল ফ্রিডরিক ভিজসাকার বললেন, আমার তো মনে হয় বোমা ফেলাটা ভয়াবহ ব্যাপার । এটা আমেরিকার পাগলামো। হাইজেনবার্গ বললেন, তা বলা যায় না । বরং ওটাই যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার একমাত্র উপায় ছিল । হান-এর প্রতিক্রিয়া : 'এই আমার সান্ত্বনা।' হানকে সেদিন সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন হয়েছিল । কেননা ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর পরমাণু বিভাজন আবিষ্কারের সূত্রেই বোমা তৈরি করা হতে পারে --একথা উপলব্ধি করে, পরের বছরই তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন । ৬ আগস্ট তিনি ফের আত্মহত্যার কথা বলেন। হান-এর বন্ধুরা এবং ব্রিটিশ অফিসার ইন-চার্জ সে রাতে অটো হান ঘুমিয়ে না পরা পর্যন্ত তাঁর ওপর সতর্ক নজর রেখেছিলেন ।

বোমা বিস্ফোরণের খবর পাবার পর জার্মানিতে বোমা তৈরির কর্মসূচির যিনি প্রধান ছিলেন সেই ওয়ালথার গেরল্যাচ পরাজিত সেনাপতির মতো আচরণ করতে থাকেন। পরে সেই রাতে হান গেরল্যাচ-কে প্রবোধ দিতে তার শোবার ঘরে যান । জিজ্ঞাসা করেন, আমরা বোমা বানাইনি বলে কি আপনি হতাশ? বোমা যে আমরা বানাইনি তার জন্য আমি কিন্তু হাঁটু মুড়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই । রাত আরো গভীর হলে তিনি হাইজেনবার্গের সাথেও কথা বলেন। মেজর রিটনারের ভাষায় তা ছিল এই রকম : হান হাইজেনবার্গকে ব্যাখ্যা করে বলেন গোটা ব্যাপারটায় তিনি মর্মাহত । তিনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না যে, গেরল্যাচ কেন ব্যাপারটা এত খারাপ ভাবে নিচ্ছেন । হাইজেনবার্গ বলেন, তিনি কিন্তু বোঝেন । তাদের মধ্যে একমাত্র গেরল্যাচ-ই জার্মানীর জয় চেয়েছিলেন। যদিও নাজিদের অপরাধ-অন্যায় সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন, এবং তা সমর্থনও করতেন না। হান বলেন তিনিও তাঁর দেশকে ভালবাসেন এবং অদ্ভুত শোনালেও সেই কারণেই তিনি জার্মানির পরাজয় চেয়েছিলেন । এরপর ফের তারা আগের বিষয় নিয়েই আলোচনা চালিয়ে গেলেন যে তাঁরা কখনই বোমা বানাতে চাননি। যখন চুল্লিতেই বেশি মনোযোগ দেবার সিদ্ধান্ত হল তখন তাঁদের, হাইজেনবার্গের মতে, নৈতিক অবস্থান আমেরিকানদের মতোই ছিল । তফাৎ এই যে, বোমা বানালে যুদ্ধে হিটলারের জয় হত। তাঁরা হিটলারের জয় চান নি। যারা এই বোমা বানিয়েছিলেন সেই ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের অনুভূতি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। হাইজেনবার্গের মতে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। কারণ ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা হিটলারকে অপরাধী মনে করতেন ।

পরবর্তীকালে হাইজেনবার্গ একই কথা ফের বলেছেন যে, তাঁরা যদি হিটলারের জয় চাইতেন তাহলে বোমা বানাতে পারতেন । সেদিন আরও দুজন বিজ্ঞানী বোমা তৈরি ও নিক্ষেপের নৈতিকতার বিষয় আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা হলেন ভিজসাকার ও কার্ল ভির্জ। দুজনেই হাইজেনবার্গের ছাত্র ছিলেন । হাইজেনবার্গ, ভিজসাকার এবং ভির্জ --এই তিনজনই জার্মানির পরমাণু চুল্লি তৈরির প্রচেষ্টার মূল দায়িত্বে ছিলেন। ভিজসাকার ওই রাত্রে বলেন, আমরা যে বোমা বানাইনি তার কারণ হল নীতিগত ভাবে সব পদার্থবিদ তা বানাতে চান নি। তবে যদি চাইতাম যে যুদ্ধে জার্মানি জিতুক, তাহলে আমরাও বোমা বানাতে পারতাম ।

এইসব কথাবার্তা থেকে গাউডস্মিট দুটো জিনিস নিয়েছেন । বোমার নৈতিকতা নিয়ে কথাবার্তা এবং কী করে তৈরি করা হয়েছিল তার নক্সা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা । ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'How the Germans lost the race' শিরোনামে *দি বুলেটিন অফ অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট*-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন গাউডস্মিট। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, জার্মান বিজ্ঞানীরা কী করে বোমা তৈরি করতে হয় তা জানতেনই না । তার মতে, বোমা তৈরির কাজে পরমাণু চুল্লি ব্যবহারের ধারণাই ছিল না জার্মান বিজ্ঞানীদের। তাদের নজর ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরমাণু চুল্লি তৈরি করাতে । বিজ্ঞানীরা তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নৈতিকতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বানিয়ে গল্প বলেছেন ।

গাউডস্মিটের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যার *নেচার* পত্রিকায় হাইজেনবার্গ একটি প্রবন্ধে বলেন যে, ১৯৪০ সালেই ভিজসাকার বলেছিলেন পরমাণু চুল্লিকে কীভাবে বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায় । অযোগ্যতার জন্য জার্মান বিজ্ঞানীরা বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত নেননি, হাইজেনবার্গ একথা অস্বীকার করেন । হাইজেনবার্গের মতে, সেই পরিস্থিতিতে তা ছিল জার্মান বিজ্ঞানীদের বাস্তবসম্মত এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ১৯৪২ সালের জটিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতি তৈরি হয়েছিল তাতে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জার্মান পদার্থবিদদের কাছে এই কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ । বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট ছিলেন এই ভেবে যে, পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের (বিভাজন আবিষ্কারের মতোই) সূত্রপাত হবে জার্মানিতে এবং যথাসময়ে তা ফলদায়ী হবে ।

কিন্তু ফার্ম হল-এর রেকর্ড প্রকাশিত হবার পর প্রশ্ন জাগে কেন গাউডস্মিট, গ্রোভস এবং মিত্রশক্তির অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, হাইজেনবার্গ ও অন্যেরা বোমা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন । *নেচার* পত্রিকায় হাইজেনবার্গ যেমন বলেছিলেন, ফার্ম হলের কথোপোকথন থেকেও তাই জানা যায় যে জার্মান বিজ্ঞানীদের বোমা বানানোর সত্যিই ইচ্ছে ছিল না ।

যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা সিদ্ধান্ত নেয় ওপথে আর এগোবে না । এই সিদ্ধান্তের কারণ পূর্ব সীমান্তে জার্মানি তখন মার খেয়ে দিশেহারা। ইতিমধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী বুঝে গেছেন একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম বোমার ক্ষমতা হবে সম পরিমাণ ডিনামাইটের চেয়ে দশলক্ষ গুণ বেশি । ডিয়েবনার হিসেব করেছিলেন যে একটি বোমা তৈরিতে দশ থেকে একশো কিলোগ্রাম বিভাজনক্ষম পদার্থ প্রয়োজন। হাইজেনবার্গ ছিলেন এই প্রকল্পের মুখ্য উপদেষ্টা । তিনি খুবই হুঁশিয়ার ছিলেন। কতটা সক্রিয় পদার্থ প্রয়োজন সে বিষয়ে তিনি পরিকল্পিত ভাবে অহেতুক বাগ্‌বিস্তার করেন । তারপর ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে যখন সামরিক কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন যে নয় মাসের মধ্যে বোমা তৈরি করে ফেলা সম্ভব কিনা, হাইজেনবার্গ পরিষ্কার জানান যে, সম্ভব নয় ।

১৯৪২ সালের জুন মাসে অ্যালবার্ট স্পিয়ার জার্মানির মিনিস্টার অফ আর্মামেন্টস অ্যান্ড মিউনিশনস হন । তিনি বেশ কয়েকজন সামরিক কর্তা ও বিজ্ঞানীর সাথে দেখা করেন । অবশ্যই এর মধ্যে হাইজেনবার্গও ছিলেন। স্পিয়ার বুঝেছিলেন পরমাণু প্রযুক্তি যুদ্ধের কাজে লাগানো যেতেও পারে । বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল বোমা তৈরি করা যায়

কিনা বুঝে নেওয়া । স্পিয়ারের সাথে মিটিং-এ হাইজেনবার্গ জোর দিয়েছিলেন পরমাণু চুল্লি এবং সাইক্লোট্রন তৈরির কাজে। হাইজেনবার্গের বক্তব্য ছিল, এই যুদ্ধের জন্য নয়, পরমাণু বোমা ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করা দরকার ।

কিন্তু বোমা তৈরির কৌশল সম্পর্কে হাইজেনবার্গের কতদূর ধারণা ছিল নীচের কিছু ঘটনা থেকে আঁচ করা যায় । ১৯৪২ সালের জুন মাসে অ্যালবার্ট স্পিয়ার ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের সাথে মিটিং-এ হাইজেনবার্গ বলেছিলেন যে, একটা শহর গুঁড়িয়ে দিতে যে পরিমাণ বিভাজনক্ষম পদার্থ প্রয়োজন তা একটা আনারসের আয়তনের সমান। ৬ অগাস্ট রাতে, হান হাইজেনবার্গকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি মনে কর ওদের বোমা বানাতে প্রায় তিরিশ কিলোগ্রাম বিভাজনক্ষম পদার্থ লেগেছে ? উত্তরে হাইজেনবার্গ বলেন, আমি নিশ্চিত । তবে আমি তা হিসেব করে দেখিনি। কারণ, আমার ধারণা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়েম-২৩৫ পাওয়া সম্ভব নয় । জানতাম ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর সাথে দ্রুত গতি নিউট্রন দিয়েই তা করা যায়। এভাবেই ইউরেনিয়াম-২৩৫ বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করা যায় ।

হানের পরের প্রশ্ন ছিল, কিভাবে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে? হাইজেনবার্গ উত্তরে বলেন যে বোমার ক্ষেত্রে তা করা যায় শুধু দ্রুতগতি নিউট্রন দিয়ে । . . . .প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিউট্রন পেতে একের পর এক ৮০টা শৃঙ্খল বিক্রিয়া দরকার . . . . .মিন ফ্রি পাথ হল প্রায় ছয় সেন্টিমিটার। ৮০ টা ধাক্কার জন্য বস্তুর ব্যাসার্ধ হওয়া দরকার অন্তত ৫৪ সেন্টিমিটার, যা প্রায় এক টন . . . .। মনে হয় তারা আরও কম পরিমাণ ইউরেনিয়াম নিয়েই করেছে । এর চার ভাগের এক ভাগ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিফলক দিয়ে তা এমনভাবে ঢেকেছে যা দ্রুতগতি নিউট্রন ফিরিয়ে দেবে । হান-এর পরের প্রশ্ন ছিল যে, কিভাবে ওরা নিশ্চিত হল যে সঠিক সময়েই বিস্ফোরণ ঘটবে, কি করেই বা তা বিমানে করে বয়ে আনল ? জবাবে হাইজেনবার্গ জানিয়েছিল, একটা উপায় হল বোমাটাকে দুটি অর্ধেক টুকরোয় তৈরি করা । প্রতিটি অর্ধেক টুকরোই ছোট বলে 'মিন ফ্রি পাথ'-এর জন্য বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না । যখন বোমাটি নীচে ফেলা হবে সেই মুহূর্তে দুটি অর্ধেক অংশ জোড়া লাগানো হবে। এবং জোড়া লাগার সাথে সাথেই শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হবে ।

হিরোশিমা শহর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে একথা শোনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাইজেনবার্গ বিস্ফোরণের প্রক্রিয়াটি কি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করেন । এক সপ্তাহ পরে তিনি তাঁর ধারণাকে আরও পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে সহকর্মীদের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেন । বক্তৃতার পর সাধারণ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানীই বোমার পদার্থবিদ্যা বুঝেছিলেন । হাইজেনবার্গ ছাড়া এই দলে ছিলেন হারটেক, ভিজসাকার এবং ভির্জ। বাকিরা যা শুনেছিলেন তা তদের কাছে ছিল একেবারেই নতুন ।

লস আলামস-এর তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান হ্যান্স বেথে যখন ৪৭ বছর পর প্রথম 'ফার্ম-হল' অনুলিপি পড়েন, তখন অবাক হয়ে যান বোমার খুঁটিনাটি সম্পর্কে হাইজেনবার্গের এমন পরিষ্কার ধারণা ছিল দেখে । তাঁর বক্তব্য: আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যতটা মনে করেছিলাম হাইজেনবার্গ তার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন । বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, একটি মাত্র সন্ধ্যায় তিনি এতসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আপাত ভাবে মনে হয়, অন্যেরা বিভাজন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতেন না । এমন কি ম্যাক্স ভন লয়ের মত বড় মাপের পদার্থবিদও তাই । বিশেষ করে জার্মান ইউরেনিয়াম প্রকল্পের প্রধান ওয়াল্টার গেরল্যাচ খুবই কম জানতেন। সব কিছুই তার কাছে এই প্রথমবারের মতো ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল ।

তাই মনে হয়, যুদ্ধের সময় হাইজেনবার্গ বোমা সম্বন্ধে ধারণা নিজের মধ্যেই সযত্নে গোপন রেখেছিলেন । তা থেকে এও বোঝা যায় যে, বিজ্ঞানীদের সাথে জার্মান সামরিক বিভাগের সম্পর্ক মোটেই আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো ছিল না । ১৯৪৫-এর ৬ অগাস্ট হাইজেনবার্গ তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন আমরা বোমা তৈরি করতে এক'শ ভাগ উৎসাহিত ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু যদি তা চাইতাম সেক্ষেত্রেও বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ধাঁচটাই এমন ছিল যে, আমাদের ওপর ভরসা ছিল কম । তাই ব্যাপারটা মোটেই সহজ হত না । হাইজেনবার্গ ১৯৪৭ সালে *নেচার* পত্রিকায় জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪২ সালে জার্মানি এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীদের পরমাণু বিভাজন নিয়ে গবেষণা ও জ্ঞান ছিল তুল্যমূল্য । কিন্তু এই জ্ঞান বোমা তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল না । একটি বিশাল খরচ সাপেক্ষ, বহুমুখী শিল্প নগরী গড়ে তুলতে হত এবং তা সুষ্ঠুভাবে চালাতে হত ।

পরমাণু বোমা তৈরিতে বিশাল শিল্প উদ্যোগ গড়ে তুলতে যে প্রচন্ড প্রচেষ্টা ও উদ্যম প্রয়োজন জার্মান কর্তৃপক্ষের তা ছিল না । বিজ্ঞানের সেই স্বপ্নের দিনে জার্মানির পক্ষে বোঝাই মুস্কিল ছিল যে অন্য কেউ পরমাণু বোমা তেরি করতে পারবে । তাছাড়া হাইজেনবার্গসহ কয়েকজন বিজ্ঞানী সম্ভবত জেনে বুঝেই জার্মান নেতৃত্বকে যুদ্ধে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা নেই বলে বুঝিয়েছিলেন । যেসব বিজ্ঞানী নাজি নেতৃত্বকে সাহায্য করতে রাজি ছিলেন তাঁদের কাছে এই বিজ্ঞনীরা গবেষণার ফল গোপন রেখেছিলো । হাইজেনবার্গের কথায় --প্রথম থেকেই জার্মান পদার্থবিদেরা প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন ।

Source:
1. Stanley Goldberg & Thomas Powers, 'Declassified Files Reopen "Nazi Bomb"', *The Bulletin of the Atomic Scientists*, September 1992.

2. Samuel Goudsmit, 'How the Germans Lost the Race', *The Bulletin of the Atomic Scientists*, March, 1946.

পরিবেশ --শিক্ষার বোঝা না বাহন ?

রবীন মজুমদার

এক সময়ে কথাটা বেশ চালু ছিল --কোনো বিষয়ে জনমানসে যদি চাহিদা ও আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে তবে বিষয়টিকে আবশ্যিক ভাবে ছাত্রপাঠ্য করে দিলেই সব ল্যাটা চুকে যায়, সব উন্মাদনা নিভে যায় । কথাটা নতুন করে মনে পড়ল স্কুল-কলেজে পরিবেশ অবশ্যপাঠ্য করার উদ্যোগ-আয়োজন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ।

নতুন প্রস্তাব অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিবেশের উপর একশো নম্বরের একটি পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে, তিরিশ নম্বর পেয়ে পাশও করতে হবে; এই পেপারে প্রাপ্ত নম্বর অবশ্য মোট নম্বরের সাথে যুক্ত হবে না বা ডিভিশন নির্ধারণে সাহায্য করেনা । মোটামুটি এ রকমই একটি ব্যবস্থা দু হাজার এক থেকে এ রাজ্যের স্নাতক স্তরে চালু আছে। আর্টস-সায়েন্স-কমার্স শাখার পাশ-অনার্সের সব পরীক্ষার্থীকেই পঞ্চাশ নম্বরের পরিবেশ বিদ্যায় (Environmental Studies), পনেরোটি নম্বর পেতেই হবে, কিন্তু প্রাপ্ত নম্বর কোনোভাবে মোট নম্বরের সাথে যোগ করা হয় না বা উত্তীর্ণের শ্রেণী নির্ণয়ে বিবেচিত হয় না । মার্কশিটে এই পেপারের নম্বর আলগোছে দেখানো হয় । এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল, কারণ পরীক্ষার্থীরা প্রচুর নম্বর পায় এবং এ পর্য্যন্ত কাউকে এ বিষয়ে ফেল করে ডিগ্রি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে শোনা যায় নি ।

এই ব্যবস্থার সাফল্যে অণুপ্রাণিত হয়েছেন পর্ষদ সংসদের ব্যবস্থাপকগণ । একে মডেল হিসেবে সামনে রেখেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের পঠন-পাঠন-পরীক্ষাগ্রহণের ছক তৈরি হয়েছে । স্নাতকস্তরে যেমনটি হয়েছে, ঠিক তেমনিই শিক্ষার্থীর উপর বাড়তি বিষয়পাঠের বোঝা চাপবে না, শিক্ষকদের উপরও বাড়তি ক্লাশের চাপ তেমন একটা পড়বে না, কোয়ালিফাইং তিরিশটা নম্বর পেতে পরীক্ষার্থীদেরও দুশ্চিন্তা থাকবে না এমনই আশা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ।

কী ভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হবে ? স্নাতকস্তরে পরিবেশ বিদ্যার পঠন-পাঠন পরীক্ষার হালহকিকৎ একটু জানলে বুঝলে এ প্রশ্ন অবান্তর গণ্য হতে বাধ্য । দু-একটি কলেজ বাদে কোথাওই প্রায় পরিবেশ বিদ্যার কোনো ক্লাশ হয় না । অবশ্য সেটা সম্ভবও হয় না কারণ সব শাখার সব ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে বসিয়ে একজন শিক্ষক ক্লাশ নেবেন, এটা অকল্পনীয়। আবার বিভিন্ন শাখার জন্য, পাশ-অনার্সের জন্য আলাদা আলাদা ক্লাশের ব্যবস্থা করতে গেলে যত শিক্ষক, ক্লাশরুম, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চির প্রয়োজন তা নিরানব্বই শতাংশ কলেজেই নেই, অদূর ভবিষ্যতে থাকার সম্ভাবনাও নেই । এসব বাধা অতিক্রম করেও ব্যতিক্রমী যে দু-একটি কলেজে ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়, সেখানেও প্রথম প্রথম কিছু পড়ুয়া হাজির হয়, কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যেই তারা উধাও হয়ে যায় । পরিবেশ বিদ্যার পাঠদানে উৎসাহী একজন শিক্ষকের আক্ষেপ কাকে পড়াব, চেয়ার-টেবিলকে ? শুনতে চাইলে তিনি আরও যোগ করবেন --অবশ্য আজকাল অনার্সের ক্লাশেই ছাত্রছাত্রীদের দেখা পাওয়া ভার, তা পরিবেশ বিদ্যার মতো এলেবেলে বিষয়ে ! পনেরোটা নম্বর পাওয়া নিয়ে তো কথা। তার জন্য ক্লাশ করার বই পড়ার যে দরকার নেই, সেটা ওদের বুঝতে কয়েকটা দিন লাগে মাত্র। চেষ্টা করলেও কাউকে ফেল করানো যায় না মশাই !

একেবারে ঠিক কথা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের কথাই ধরা যাক । 'সঠিক' উত্তরে টিক মেরেই পাওয়া সম্ভব চব্বিশ নম্বর । কুড়িটার মধ্যে বারোটায় টিক মেরে উত্তর করতে হবে । যারা একটু চালাক চতুর, তারা যে কটা পারে সে কটায় টিক মেরে বাকিগুলোতেও ইচ্ছেমতো-আন্দাজে টিক মেরে আসে। ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটার বিধান নেই । সঠিক উত্তরের সংখ্যা বারোটার মধ্যে থাকলে সব কটার নম্বরই পাওয়া যায় । এরপরও আছে দু-লাইনে উত্তর দেবার কুড়ি নম্বর। কুড়িটার মধ্যে দশটার উত্তর করতে হবে। এখানেও যা হোক এক-আধ লাইন করে কয়েকটা লিখলেই পরীক্ষক বেজায় খুশি হন ।

তা সত্ত্বেও যদি কেউ পড়তে আগ্রহী হয়, তবে প্রশ্নোত্তরের টোটকা বই আছে, দামে কম, কাজে দড়। আরো সস্তার প্রশ্নোত্তরের জেরক্সে আগের রাতে চোখ বুলিয়ে নেয় কেউ কেউ। কোনো কোনো কলেজে দরদী কোনো শিক্ষক স্বতোপ্রণোদিত হয়ে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর জেরক্স করে বিলি করেন । এই পরীক্ষাটাও বেশ হাল্কা মেজাজে দিতে পারে পরীক্ষার্থীরা । দু'ঘন্টার পুরো সময় হলে বসে থাকে না প্রায় কেউই, আধঘন্টার মধ্যেই অর্ধেক হল ফাঁকা হয়ে যায় । এমন কী টোকাটুকি বা হল-কালেকশনের প্রতিও কারও আগ্রহ দেখা যায় না । সহজ সুন্দর সফল ব্যবস্থা নয় কি ? এমনি এমনি এটা হয়নি, এর পিছনে আছে প্রচুর চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা । সিলেবাস তৈরি থেকে প্রশ্নের কাঠামো, নম্বর দেবার পদ্ধতি সবেতেই আছে পরম যত্ন , যাতে কোনো কোনো বিষয়ের বাড়তি শিক্ষকদেরও কাজে লাগানো যায়; শিক্ষকের যেখানে ঘাটতি সেখানে নতুন করে চাপ সৃষ্টি না হয়। শিক্ষার্থীরা তো পুত্রকন্যাসম, অপরিহার্য সিলেবাসের ভারে নুব্জপ্রায়, তাদেরও প্রাপ্য উপযুক্ত স্নেহমমতা । অন্তত পরিবেশ বিদ্যার ক্ষেত্রে তাতে কার্পণ্য ঘটেনি ।

স্নাতকস্তরে পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ১৯৯৪ সালে । প্রস্তাব ছিল একশো নম্বরের একটি পেপারের পঞ্চাশ নম্বর হবে পাঠভিত্তিক আর বাকি পঞ্চাশ নম্বর থাকবে প্রোজেক্ট-ভিত্তিক । হাতে-কলমে পরিবেশ চেনা, সমস্যা জানা, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া এরকম নানা কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সচেতনতার পাঠ নেবেন এবং তার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা নেবেন, ভাবনা ছিল এরকমই । কিন্তু অনেক বিচার-বিবেচনার পর এ-রাজ্যের পুরোধা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যরা পরিবেশ-বিদ্যার যে পাঠক্রম চালু করল, তাতে প্রোজেক্ট গেল বাদ (ব্যতিক্রম বিশ্বভারতী), শুধু তত্ত্ব-তথ্য লিখিত পরীক্ষার উপর পঞ্চাশ নম্বর বরাদ্দ রইল। আমাদের কলেজীয় পরিকাঠামোয় প্রোজেক্ট করানো সম্ভব নয়, এই মতে সায় মিলল সকলেরই। ইউ জি সি অবশ্য এতে একাধিকবার অসন্তোষ জানিয়েছে ।

মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদের (NCERT) প্রস্তাব মেনে প্রোজেক্টও অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। কলেজে যা করা সম্ভব ছিল না, তা স্কুলে কি করে সম্ভব হবে ? স্কুলগুলিতে কি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ক্লাশরুম এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর কোনো অভাব নেই? প্রশ্ন করা, পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখার চাপে শিক্ষকদের এমনিতেই নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা । পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উৎকৃষ্ট সরকারি স্কুলেও শিক্ষকের অভাবে বিভিন্ন ক্লাশে সপ্তাহে একদিন বাড়তি ছুটি ঘোষণার যেসব কথা শোনা যাচ্ছে সেসব কি ভিত্তিহীন গুজব? না, না, অত চিন্তার কোনো কারণই নেই, থাকতে পারে না । ব্যবস্থাপকগণ বরং আশা করছেন প্রোজেক্টের পঁচিশ-তিরিশ নম্বর, পাশ নম্বর তুলতে বেশি করেই সহায়ক হবে । পরিবেশ-প্রোজেক্ট করার জন্য কি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দল বেঁধে পরিবেশের নোংরার মধ্যে নেমে পড়তে হবে ? মোটেই না। অনতি-অতীতের কর্মশিক্ষার জমানার অভিজ্ঞতায় আমরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অর্ডার-মাফিক ছাপানো পরিবেশ-প্রোজেক্ট রিপোর্ট স্কুলের পাশের 'কর্মশালাটি' থেকেই পাওয়া সম্ভব । অল্পসংখ্যক কিছু উদ্যোগী শিক্ষকের এতে বিলক্ষণ টু'পাইস উপার্জন বাড়বে, অভিভাবকের একটু খরচা হবে ঠিকই, কিন্তু বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটবে তা তো আর ফেলনা বা উপেক্ষণীয় নয় ।

পঠন-পাঠনেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আসার প্রভূত সম্ভাবনা । কলেজে পরিবেশ বিদ্যার পাঠক্রম রচনার সময় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে ছিল যে ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি সমাজবিদ্যা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জুলজি বটানির শিক্ষকরা দু'চারটি করে ক্লাশ নিয়ে পরিবেশ বিদ্যার বিভিন্ন অংশ পড়িয়ে দেবেন । স্পষ্ট করে নির্দেশ না থাকলেও সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই মোটামুটি এটাই নীতি । এখন স্কুলেও এই নীতি পদ্ধতিই অনুসৃত হতে চলেছে। নিজেকে পড়ুয়ার জায়গায় কল্পনা করলে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জাগে না কি ? পরিবেশেই তো পরিবেশ সীমিত নেই এখন, সব বিষয়ের পাঠ্যসূচিতেই পরিবেশ ঢুকে সেগুলিকে স্ফীত করে তুলেছে, তার উপর থাকছে শুধুই পরিবেশের পৃথক পেপার । কাজেই সবাই মিলেই সেটা পড়ানো যায়, পাশ করানোর ব্যাপারে উদার ও নমনীয় থাকাই যায়। ইতিমধ্যে আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে পরিবেশের বিভিন্ন পাঠক্রমে স্নাতোকত্তর ডিগ্রিধারী শত শত তরুণ-তরুণী হন্যে হয়ে কাজ ও জীবিকার সন্ধান করে করে হতাশ হলেও, স্কুল কলেজে তাদের নিয়োগ হবে নিতান্ত অপচয় !

একটি বাড়তি বিষয় হিসেবে স্কুলকলেজে পরিবেশ অবশ্যপাঠ্য করার জন্য এত ব্যাকুলতা কার, কেনই বা ? মনে রাখা দরকার যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই ইউ. জি. সি. বা এন. সি. ই. আর. টি. যথাক্রমে কলেজ বা স্কুল স্তরের পাঠ্যে পরিবেশ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছেন। ইউ. জি. সি. বা এন. সি. ই. আর. টি. তাদের প্রস্তাব মানতে কাউকে বাধ্য করতে পারে না, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করা একরকম বাধ্যতামূলক । সুপ্রিম কোর্টই আগ বাড়িয়ে দেশের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে চাইছেন, নাকি কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থাগুলি কৌশলে সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য নিচ্ছেন তা জানি না, তবে একথা ঠিক যে বিষয়টিতে আগ্রহের কেন্দ্র দিল্লিতেই ।

এভাবে উপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা উচ্চমাধ্যমিক সংসদ --সকলেই পড়েছেন মহা ফাঁপরে । এমনিতেই প্রতিটি স্তরের শিক্ষাসূচি বিষয়ভারে জর্জরিত, তার উপরে আবার পরিবেশ ? সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে -গোছের ব্যবস্থার উদ্ভাবন তো সোজা কথা নয় !

কিন্তু মূল প্রবক্তা যেই হন, তাঁদেরই বা এত মাথাব্যথা কেন ? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা কি তাদের অজানা? শিক্ষার্থীদের প্রতি কি তাঁদের কোনো মমতা বা দরদ নেই ? আরও বোঝা তাঁরা কেন চাপাতে চান ? এর উত্তর বোধহয় নিহিত আছে আজকের পৃথিবীর একটি মূল দ্বন্দ্বে --যা আন্তর্জাতিক থেকে জাতীয়, সেখান থেকে নানা আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে বিস্তৃত ।

আর্ন্তজাতিক স্তরে শিক্ষার দিশা পাল্টানো এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের (Sustainable Development) পথে হাঁটার শপথ নেওয়া হয়েছিল সেই ১৯৯২ সালেই ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়নের আলোচনা সভায়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে তখনই শনাক্ত করা হয়েছিল একুশ শতকের উন্নয়নের দিশা হিসেবে। এজেন্ডা ২১-এ সূচিত হয়েছিল তার কর্মসূচি, আর তাতেই নিহিত ছিল শিক্ষার দিশা পরিবর্তনের কথাও । দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বিকশিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত । এ এমন এক ধারাবাহিক উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রকৃতি পরিবেশকে সুরক্ষিত ও উৎপাদনশীল রাখবে ভবিষ্যতের সমস্ত জীব ও মানুষের জন্য; এ এমন

এক উন্নয়ন যাতে আর্থিক অগ্রগতি, সামাজিক প্রগতি ও পরিবেশের সুরক্ষা হাত ধরাধরি করে চলবে। আর এ উন্নয়নে শিক্ষা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার । সে শিক্ষার অবশ্য নতুন দিশা নতুন অভিমুখ দরকার। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষায় যারা অগ্রগণ্য তারাই তৈরি করেছে নানা জটিল সমস্যা ও সংকট, সেই শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের সহায়ক নয় । কেমন হবে সেই নতুন দিশা? কথা হচ্ছে --এ শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রয়োজন ও সামর্থ্যকে কেন্দ্র করে, হবে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়, অভিজ্ঞতাভিত্তিক ; এ হবে জীবনের শিক্ষা, জীবনভর শেখার আগ্রহ ও উপাদান থাকবে এতে। শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদি না হলে উন্নয়নও স্থায়ী হতে পারে না ।

এইসব চিন্তা ও ভাবনার ফসল হিসেবে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের আসনে বসিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে একের পর এক ঘোষিত হয়ে চলেছে নানা লক্ষ্য ও কর্মসুচি --মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (MDG)-এর পরে এসেছে এডুকেশন ফর অল (EFA), এসেছে ইউ. এন. লিটারেসি ডেকেড (UNLD) এবং সবশেষে ঘোষিত হয়েছে ইউ. এন. ডেকেড অফ এডুকেশন ফর সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট (UNDSED)। ২০০৫-২০১৫ সময়কালে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার দশক উদযাপনের জন্য ভারপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে ইউনিসেফ (UNICEF) বিভিন্ন কর্মসুচির উদ্যোগ নিচ্ছেন । আমাদের এ দেশেও এই দশক পালন ও উদ্‌যাপনের ঢেউ আছড়ে পড়বে অচিরেই। কেননা ভারতও এর অংশীদার, স্বাক্ষরকারী দেশ ।

আর্ন্তজাতিক চুক্তি, ঘোষণা, অঙ্গীকার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা-উন্নয়ন ও পরিবেশের মেলবন্ধনের এই যে সদিচ্ছা ও কর্মসুচি, ভারতে তার সমর্থক অনেকে আছেন । সুপ্রিম কোর্ট এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থাগুলি তারই অংশীদার -মেনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয় । কিন্তু মুশকিল হল আদেশ-নির্দেশে কাজের কাজ কিছু হয় না, যদি না সেই কাজ যাঁরা করবেন তাঁরাও তা মনেপ্রাণে করতে চান, যদি না আর্থিক পরিকাঠামোগত আইনগত নীতিগত বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে কাজটা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় ।

আর এখানেই প্রকট সেই দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিবিধ দিবস বর্ষ দশক ঘোষণা ও পালনের পাশাপাশিই বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের (WTO) পরিচালনায় পৃথিবীব্যাপী চলছে বাজারের, মুক্ত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার অভিযান । অর্থ ও প্রশাসনের লাগাম যাদের হাতে তারা চাইলে তবে না দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথের পথিক হওয়া, আর সেই পথে চলতে চাইলে তবে না তার উপযোগী করে শিক্ষাকে সাজানো বা গড়ে তোলার প্রয়োজন ? এ-ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি? এক কথায় বলা যায় ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। একবার আমরা বলছি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য (জাতীয় পরিবেশনীতি -১৯৯৪), আবার সংশোধন করে তা বাতিল করছি (জতীয় পরিবেশনীতি-২০০৪, *বি ও বি* ২০০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে চলেছে নানা বিচিত্র পথে । কেউ বলছেন বাণিজ্য-বিশ্বায়ন একটা অপরিহার্য বিশ্বনিয়তি, ইচ্ছে না থাকলেও চলতে হবে এর সাথে; কেউ বলছেন এই অন্যায় অসম বিশ্ববাণিজ্যের নিয়মনীতি আমাদের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক ভবিষ্যতে আমরাই এর ফায়দা তুলবো বেশি করে । কারও বা অভিমত, কৌশলগত ভাবে মানছি, মূলস্রোত থেকে বিচ্ছন্ন তো হতে পারি না। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা একে হটিয়ে দেব । সবচেয়ে সুমধুর কণ্ঠস্বরটি হল, বাজার বাণিজ্যের বিশ্বায়নের এই পথই দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথ ।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ কী ভাবে আসবে সেও এই দ্বন্দ্বেরই এক বহিঃপ্রকাশ। পরিবেশ শিক্ষা কী দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার দিশা পরিবর্তনের সূচনা করবে নাকি মুক্তবাণিজ্যের সহায়ক একটি বিষয় হবে ? ভারতের ভাবী নাগরিকদের জন্য, উত্তরপ্রজন্মের জন্য, কোন শিক্ষার নিদান? আমাদের কোনো স্থির নীতি নেই, আমরা নমনীয়তায় আস্থাবান । এও চলুক তাও চলুক। তাই আমরা আর একটি বিষয়ের শিক্ষার বোঝা চাপাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের দুঃখে কাতরও হতে পারি। আবার একই সঙ্গে এটি চাপাবার বাধ্যবাধকতা এড়াতেও অক্ষম । এর জন্য উত্তরপ্রজন্মের ভাগ্য ছাড়া কাকেই বা দোষ দেওয়া যায় ?

আমরা যতই আমাদের অক্ষমতা আড়ালের প্রয়াস করি উত্তরপ্রজন্ম কি চিরকাল অবোধ মূক থাকবে ? কোনদিন তারা আমাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলবে না তো --তোমরা অগ্রজরা আমাদের ভঙ্গী দিয়ে ভুলিয়েছ; সন্ততিদের জীবন জীবিকা অস্তিত্বের পরিবেশকে তো বিষিয়েছই, এমনকী তার প্রকৃত অবস্থাটাও আমাদের জানতে বুঝতে দাওনি; পরিবেশের উন্নয়নের শিক্ষার সব সমস্যার দায়টা আমাদের ঘাড়েই চালান করে দিয়েছ --এটা জঘন্যতম এক্সটারনালাইজেশন নয় কি ?

পিতা, পুত্র ও এক অপবিত্র যুদ্ধ

এ. পি. শুক্ল

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এ প্রদত্ত প্রথম সমরেন্দ্রনাথ সেন স্মারক বক্তৃতার (২০০৫-এর জুলাই) সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ এটি। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক অশোক প্রসুন চট্টোপাধ্যায়। এ. পি. শুক্ল কানপুর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। সামাজিক বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিত।

'সম্পদ ও শ্রমের অসম বন্টন, মানুষে মানুষে পদমর্যাদা ও অবস্থার ফারাক এগুলি সভ্যজগতের ক্ষমতার উৎস, তার চালিকা শক্তি, এমন কী তার প্রকৃত স্বরূপ ।'
হামফ্রি ডেভি (উনিশ শতক)

'প্রতি জেনরেশন, তার ঠিক আগের জেনরেশনের নৈতিক চেতনায় কিছু না কিছু নিন্দা করার মত খুঁজে বার করে ।'
মেরি ডগলাস (বিশ শতক)

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ সেনের কাজ সম্পর্কে যতটুকু জানি তাতে যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল তাঁর প্রচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস বাংলায় লেখার অঙ্গীকার । যে কোনো ব্যাক্তির পেশাদারি দায়িত্বের মধ্যে নিজের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । শ্রী সেনের মতো অগ্রণীরা আমাদের প্রচুর উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন । এই কাজ People's Science Movement (PSM) বা জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । আমার আলোচনার অনেকটাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যকার জটিল এবং চির-পরিবর্তনশীল সম্পর্ক নিয়ে থাকবে ।
এবার কিছু পরিচিতির প্রসঙ্গে আসি। প্রথমে আমার আলোচনার ত্রিমাত্রিক শিরোনামের বিষয়ে বলি। এখানে পিতা হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন ডেসমন্ড বার্নাল, যাঁর কাজ সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অল্প বিস্তর পরিচিত । পুত্র এখানে তাঁরই ছেলে মার্টিন বার্নাল, *Black Athena: Fabrication of Ancient Greece 1785-1985* (Vol.1, 1987 এবং Vol.2, 1991) নামক বইয়ের অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত লেখক। আর অপবিত্র যুদ্ধ মানে Globalised Communist Revolution (GCR) তথা বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব। এই শেষোক্ত বিষয়টির সহজ কিন্তু একটু এলোমেলো বিবরণ পাওয়া যাবে উইলিয়াম হিন্টনের *The Hundred Day War* নামের বইয়ে । যেখানে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের ১৯৬৭ সালের ঘটনার বিবরণ আছে । সাংস্কৃতিক বিপ্লব সেই বিপ্লবেরই অংশবিশেষ, যার একটি উত্তপ্ত অধ্যায় ছিল বিগত ষাট ও সত্তরের দশকের চীনের সংস্কৃতিক বিপ্লব। আজকের আলোচনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পর্বের বিজ্ঞান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারাগুলির পরিবর্তন নিয়েই কথা বলব। এই পরিবর্তনে ভিন্ন বয়সের লোকের দৃষ্টিভঙ্গির যে তফাৎ থাকে, অধ্যাপক ডগলাসের উদ্ধৃতি সে দিকে যথেষ্ট ইঙ্গিত করছে । আমার চর্চার অন্যতম বিষয় হল বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে যে নতুন চেতনার উন্মেষ হচ্ছে তার অনুসন্ধান, যাকে বলছি বৈজ্ঞানিক আধুনিকতা। যার একটি স্বরূপ হল বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে যে বিজ্ঞান-চর্চা সেটা। আমার ধারণায়, তিরিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮) দিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবে । এখানে আমি এই বহু-শতাব্দীব্যাপী ধারার কেবল বিশ শতকের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকব, বিশেষ করে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্বে বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার ধারায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সেই নিয়ে আলোচনায় । তারও মধ্যে বিশেষ করে জন-বিজ্ঞান আন্দোলনে বামপন্থী উদ্যোগের সমস্যা হবে আমাদের বিচার্য বিষয় । জন-বিজ্ঞান আন্দোলন বিজ্ঞান-চর্চা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই দুয়েরই বৈশিষ্ট্য বহন করে । জ্যেষ্ঠ বার্নাল এই ধারার একজন পথিকৃত, অন্তত আমাদের মতো ইংরেজি ভাষা জানা বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে । অন্যদিকে আছে ইওরোপ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের বাড়াবাড়ির ব্যাপারটা এখন নানা দিক থেকে সমালোচিত হচ্ছে । এই পশ্চাদমুখী বাড়াবাড়িকে আমি White Aglo-Saxon Protestant (WASP) বা অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট-মডেল বলব । অন্তত কিছু ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বায়নের সময় অনেক বেশি জোরদার হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের যে আর্য চেহারা এতদিন পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একে নিছক গল্প-কথা বলে মার্টিন বার্নালের কাজ এই আন্দোলনে সাহায্য করেছে । বর্তমানে গ্লোবালাইজ্‌ড বা বিশ্বায়িত আমেরিকান যাকে আমি গামেরিকান স্রোত বলছি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া দরকার। প্রতিবাদ নানা ভাবে হতে পারে। তবে আমি সুপার-

পাওয়ার ধরণের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা অথবা ধর্মীয়-পুনরুত্থানবাদী ধারণার কোনোটাই সমর্থন করি না। দুই-ই আমার মতে সমাজকে পিছন দিকে নিয়ে যায় ।

আমাদের দরকার সামনে এগোনোর মতো কোনো বিকল্প রাস্তার অনুসন্ধান করা । আমার ধারণা, এই বিকল্প সন্ধান মিলতে পারে দেড়'শ বছরের পুরনো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষার সাথে আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনা মিশিয়ে । এই বিকল্প পথে আমাদের কাজকর্মকে যত বেশি বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক চিন্তধারার সাথে মিলিয়ে নিয়ে এগুতে পারব, ততই আমরা আমাদের পশ্চাদমুখিনতার বোঝা ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হব ।

আমি কীভাবে র‍্যাডিকাল বামঘেঁষা জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন অংশীদার হয়ে উঠেছি সে বিষয়ে কয়েকটা কথা এখানে বলি । গত ৩৫ বছর ধরে আইআইটি কানপুরে কর্মচারীদের সাথে তাদের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনে আন্তরিকভাবেই অংশ নিয়েছি। প্রথমে শুধুই ট্রেড ইউনিয়নে, পরে জন-বিজ্ঞান আন্দোলন ও সেই সম্পর্কিত কাজে। এখান থেকে বোঝা বিজ্ঞানের সমালোচনার দিকগুলি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই । ওখানকার বি. টেক কোর্সে একটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানোর অভিজ্ঞতাও আমার এই ধারণা গড়ে ওঠায় অনেকখানি সাহায্য করেছে । এই সমস্ত কাজ-কর্ম জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মানুষের জন্য বিজ্ঞান না বিজ্ঞানের জন্য মানুষ, এই ধরণের বিতর্কগুলি আমায় বুঝতে সাহায্য করেছে । সেই অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা আর সাধারণ মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক আধুনিকতা তুলে ধরার মধ্যে যে বৈপরীত্য তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক ।

ভবিষ্যতের ছবি

আধুনিকতার হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট মডেলের একটি দুর্বলতা হল এটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি-সরল আর ভুল ধারণা গড়ে তোলে । এই মডেলে 'র‍্যাশনালি' অতীতকে পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং তাকে যান্ত্রিকভাবে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে ভবিষ্যত কল্পনা করার চেষ্টা করা হয় । এই প্রক্রিয়া কাজ করেছে জড় জগতকে ভাল করে দেখে তার ওপর পরীক্ষা করে তাকে পাল্টাতে শিখে । এই বৈজ্ঞানিক আধুনিকতা শাসকশ্রেণীর ঘরানায় মিশে গিয়ে এই বিশ্বাস তৈরি করে যে, মানব সমাজের সব কিছুই যান্ত্রিক কার্যকারণবাদ মেনে চলে। এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা যেকোনো পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যায় ।

আসলে বর্তমানের বাস্তব চেহারার সঙ্গে অতীত আর ভবিষ্যতের ধারণা ঠিকমতো মেলানো চাই । এই মেলবন্ধন দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু দু'রকম। অতীতের অনেকটাই ফিরে দেখার মধ্য দিয়ে পুনরাবিষ্কার করা যায়, কিন্তু ভবিষ্যতের ছবি কল্পনার রঙে আঁকা ছাড়া গতি নেই । তাই অতীতের ধারণায় অনেক যুক্তি বিচার বাস্তবতা থাকলেও ভবিষ্যতের ধারণায় তা নাও থাকতে পারে । আমাদের আশাবাদের অনেকটাই ভবিষ্যতের কাছে আমাদের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনাও তাই আমরা কোন দিকে যাচ্ছি তার ওপর নির্ভরশীল। যার অনেকটাই কিন্তু আবার কল্পনা দিয়ে তৈরি ।

আমাদের ভবিষ্যতের আরেকটা দিক হল আমাদের কাজকর্মে দ্রুত বিশ্বায়ন। সাধারণ ভাবে যাকে 'বিশ্বায়ন' বলা হচ্ছে তা আসলে আর্থিক পুঁজির এক নয়া সাম্রাজ্যবাদ, যার মধ্য দিয়ে এই পুঁজি পৃথিবীশুদ্ধ মালপত্র, শ্রম, লোকজন আর পরিষেবার ওপর খবরদারি করছে । এই কারণে গত পনেরো বছরে আমাদের দেশের সর্বনাশ হয়েছে। আমরা যাকে বিশ্বায়ন বলব তা পুরো অন্য রকম। আমি একে প্রগতিশীল বিশ্বায়ন বলি। এটা শ্রমের স্বাধিকার অর্জনের দিক থেকে এক নতুন মানবিক সৃজন। বস্তুত এই পৃথিবী দুটো বড় স্থলভাগে বিভক্ত -আফ্রো-ইউরেশীয় আর আমেরিকান। ঐতিহাসিক কারণে প্রথমটি বহুদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে চলেছে। এখানে মানব সমাজের তিন-চতুর্থাংশ লোক বাস করে। দ্বিতীয়টি গুরুত্ব পেয়েছে কেবল বিগত শতাব্দী থেকে। তা আবার এক নতুন মাত্রা পেল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে যখন পুঁজি আর সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেল। আমরা এমন এক অদ্ভুত সময়ে রয়েছি যখন সমগ্র মানব সমাজের মাত্র প্রায় ছয় শতাংশ লোক যে দেশে বাস করে, সারা পৃথিবীর কাঁচামালের প্রায় চল্লিশ শতাংশ তাদের দখলে চলে গেছে । প্রগতির রাস্তা তাই লুকিয়ে আছে প্রথম স্থলভাগের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের মধ্যে।।

এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক লোক বাস করে ভারতীয় উপমহাদেশে, চীনে আর রাশিয়ায়। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতির মধ্যে এই দেশগুলি রয়েছে। তিনটি দেশই বিশ শতকের বিশ্বায়নের ওঠাপড়ায় বিশেষ অংশ নিয়েছে। বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিবর্তনেও তিনটিরই বড় ভূমিকা ছিল। আবার বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো এই তিনটিতেও বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের আঁচটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে গত কয়েক দশক ধরে। এটা বহু বিপ্লবীরই আশাভঙ্গের কারণ। ভবিষ্যতের ছবি তৈরির একটা দিক হল বাস্তব কাজের ভিত্তিতে আশার আশ্রয় ফিরে পাওয়া, যাতে বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়। আমার কাছে রাস্তা হল আধুনিকতার গামেরিকান হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট মডেল থেকে মুক্তির কাজে সামিল হওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে মেলামেশা এই কাজকে তাড়াতাড়ি

এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু মেলমেশার কাজটাও লোককে জানতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজের দেশে অনাচারের বিরুদ্ধে, শোষণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পদ্ধতিটাও জানতে হবে। প্রগতির এই রাস্তা খুলে দিতে গেলে সবচেয়ে আধুনিক গবেষণায় পাওয়া আধুনিকতম বিচার পদ্ধতি দরকার। আমাদের সহায় বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের দীর্ঘ বিচিত্র ১৫০ বছরের ঐতিহ্য --ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে অনেক বিপ্লবের উত্থানপতন আর ব্যক্তিমানুষ থেকে বড় সংগঠন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শক্তি আর দুর্বলতা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা --এসবই আমাদের সঠিক পথ দেখাবে। এর থেকে পাওয়া ধারণা আমরা যতটা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারব, ততটাই আধুনিকতার হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট মডেল নিয়ে সমালোচনায় অধিকার জন্মাবে।

পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই আর সাংস্কৃতিক বিপ্লব

পুঁজিবাদী শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণী, যে কোনো শ্রেণীরই প্রগতির হাতিয়ারের তিনটি ভাগ আছে: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক । আমার ভবিষ্যতের ছবিতে এই তিন রাস্তায় আন্দোলন, বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা ভাগের সাথে মিলে এক হয়ে যায় । এই আশার চেহারা দেওয়া যায় এরকম একটি প্রস্তাবনায় :
বন্দুকের নল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস তখনই যখন তা নতুন উৎপাদন শক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে । সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিবার আর তৃণমূল স্তরের শ্রেণীসংগ্রামের ওপর নির্ভর করে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় ।
বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের ইতিহাস এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় তা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে লম্বা লড়াই করেছে, কিন্তু পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে এগোতে পেরেছে সামান্যই । সমাজের এই অসুখটি ব্যক্তি মালিকানার অত্যাচারের মতই পুরনো । প্রকৃত গণতান্ত্রিক জীবন সম্ভব হতে পারে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। সাধারণ ভাবে বামপন্থা বলতে এমন একটা ঐতিহ্য বহন করে যা মনে করা হয় কেবল পুরুষদের ব্যাপার, মোটামুটি কর্মক্ষেত্রের বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অংশগ্রহণকারীদের বয়স নিদেন পক্ষে উনিশ কুড়ির মধ্যে । এতে সমাজের তিন চতুর্থাংশ লোককেই সম্মুখ সমর থেকে বাদ দেওয়া হয়, এটা বেশ বড় একটা দুর্বলতাও বটে । এই সমস্যাটা আমরা কয়েকজন ভালো করে বুঝতে পারি আইআইটি-র শ্রমিক সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করবার সময়। আমরা তিনজন মধ্যবিত্ত মানুষ এই আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের সাথে মেলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছি। প্রায় এক'শ জনের এই ছোট সংগঠনের সঙ্গে আমরা বছর দশেক কাজ করি। এঁরা অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়েই কাজ করতেন । নেতাদের সততার সুবাদে এদের সংগঠন ক্রমে বেড়ে ওঠে। কিন্তু এই ছোট গোষ্ঠীকেও পুরোপুরি, সেই ব্যাধিমুক্ত গণতান্ত্রিক রাস্তায় নিয়ে আসা আমাদের ক্ষমতায় কুলোয় নি । সাধারণ সদস্য থেকে নেতারা, কেউই এই কাজকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয় নি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই রকম অনীহা কেবল প্রতিযোগিতামূলক, ভোগবাদী অর্থনীতিবাদের আবহই তৈরি করে । (৩)
সংস্কৃতির আরেক দিক হল ব্যক্তি মানুষ আর ব্যষ্টি মানুষের সঠিক আদর্শগুলি জীবনে সমন্বিত করার সচেতন সুচিন্তিত প্রয়াস । বর্তমানে এই স্থান দখলের লড়াইয়ে রয়েছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সর্বশক্তিশালী ডলার এবং সর্বশক্তিধর শ্রমিকশ্রেণী । শেষেরটি এই তালিকায় যোগ হয়েছে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলে । কিন্তু গত ১৫০ বছরের ইতিহাস দেখায় যে, এই সংস্কৃতিটি এখনও বেশ দুর্বল । এর কারণ বোধহয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের চেয়ে অনেক ধীরে ঘটে, বিপ্লবের বদলে অনেকটা বিবর্তনের মতো বলে ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে প্রগতির শক্তিতে পরিবর্তন করা

'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে কোনো লোক একই সঙ্গে বুর্জোয়া এবং সাধারণ মানুষ। দ্বন্দ্বকে সে বড় করে দেখে কারণ তা ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই । সে যেন চলমান সামাজিক দ্বন্দ্ব । এবং তার জন্যই সে সমস্ত ভবিষ্যৎ সামাজিক বিপ্লবের কেন্দ্রে থাকবে ।' --একথা মার্কস লিখেছেন ১৮৪৬ সালে । তাঁর নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচয় নিয়ে অল্পবয়েসী মার্কসের এই গভীর মন্তব্য আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে । এই কথাগুলি প্রুঁধোর মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে মার্কসের লেখা থেকে সংক্ষিপ্ত আর সামান্য পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে । কথাগুলো মার্কস লিখেছিলেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখারও আগে । গত ১৫০ বছর ধরে ভোলগা, গঙ্গা, আমাজন জাতীয় জীবনের বহমান প্রতীকগুলো দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গেছে । কিন্তু ক্রম পরিবর্তনশীল, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিদ্যমান ও হয়তো সর্বশক্তিমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক পরিবর্তনের ধ্বজা বয়ে চলেছে, তা সে স্থিতিশীলতার পক্ষেই হোক কিংবা বিপ্লবের দিকেই হোক। হামফ্রি ডেভি, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বার্নাল সকলেই তাঁদের মধ্যবিত্ত অবস্থার প্রতিভূ। তাঁদের কাজও তাই শোষক ও শোষিত বর্গের মধ্যে লড়াইয়ের বিভিন্ন অবস্থা আর দিক নির্দেশ করে। বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি তার অনেকটাই এই শ্রেণীর লোকের মাধ্যমে, ফলে আমাদের শ্রেণী স্বার্থের রং তাতে ভালমতই লাগানো । প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই স্বার্থের একটি মাত্রার

কথাই বলব, এবং তার আনুষঙ্গিক দ্বন্দ্বের কথাও । আমরা বেশির ভাগই আরাম কেদারায় আসীন রাজনীতিক, সমাজের দুরবস্থা সম্পর্কে উচ্চমার্গের বিধান দিতে ভালোবাসি। 'কিন্তু আসলে প্রয়োজন হচ্ছে তাকে পালটে ফেলা।' আমাদের সমস্যা হল আমরা বড় কিছু করতে ভয় পাই। আর একই সঙ্গে মনে করি, স্বাভাবিক কারণেই, ছোট কিছু করা মানে সময় নষ্ট করা । অতএব আমরা 'সিস্টেম' বা পারিপার্শ্বিককে দোষ দিই, একমাত্র তাই যেন আমাদের ইতিহাস রচনায় বাধা সৃষ্টি করে ।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া থেকে প্রেরণা পেয়ে এই সমস্যা আমি কাটিয়ে উঠেছি । একজন বিজ্ঞানকর্মী তার কাজের ক্ষেত্রে প্যারাডাইমের প্রতি একনিষ্ঠ আর অটল থাকবে, যা সে বহুদিনের চর্চায় শিখেছে । এই প্যারাডাইমকে বড় বড় দাবি রাখতে হয়, স্বপ্ন দেখাতে হয়, চিন্তার খোরাক দিতে হয় যাতে যুবক-যুবতীদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে তাদের বেশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে রাখা যায় । এতসব দাবির পরও একজন বিজ্ঞানকর্মী কাজের জন্য কিন্তু একটি ছোট এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যাই বেছে নেয়, আর তার সমস্ত শিক্ষা দিয়ে তার সমাধান করতে চেষ্টা করে । সমাধান প্রায় নিশ্চিত থাকায় তার উদ্যমও বজায় থাকে। এরকম একের পর এক ছোট ছোট সমস্যা সমাধান করে তার মানসিক নিরাপত্তাবোধ আর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এইভাবে ব্যক্তি মানুষটি তার কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ভিড়ে ঝাঁকের কইয়ের মতো মিশে যায় । কুন এবং তাঁর বহু অনুগামী, যেমন কনিষ্ঠ বার্নাল, এই সমস্যা-প্যারাডাইম পদ্ধতিতে গবেষণার ভাল মন্দ দুই-ই পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন ।

এই পদ্ধতি মেনে নিলে, আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের মানে নিয়ে জটিলতার সমাধান হতে পারে । সমাধান হতে পারে সামাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নিজের অবস্থান নির্ণয়ের সমস্যা সমাধানেও । এর ফলে কোনো মানুষ নিজের দোষ-গুণ সততার সঙ্গে বিচার করতে পারে । তাতে আশপাশের অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের বা কয়েক ধাপ কম সুবিধের স্তরে থাকা লোকজনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করা সহজ হতে পারে । জন-বিজ্ঞান বা লোক-দিয়ে-বিজ্ঞান হল এই ধরণের সম্পর্ক বা প্রক্রিয়ার কথা । আর লোকের-জন্য-বিজ্ঞান-এর কাজ হল 'দেখ-আমরা-কত-জানি' মার্কা মধ্যবিত্ত ভণ্ডামি। এটা হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দুই প্রান্তের দুপক্ষের মধ্যে সেতু হয়ে কাজ করে নিজেদের গণতান্ত্রিক বোধকে তৃপ্ত করা । এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারলে আমাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াবে ক্ষমতাসীনদের দালাল হিসেবে কাজ করা । সেটা চলতি ব্যবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখার কাজ করবে ।

সাধারণ কথা ছেড়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আসা যাক । কোনো এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনে আমার সব চেয়ে উপযুক্ত কাজ হতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের চরিত্র আনুধাবনের ক্ষেত্রে। কাজের ক্ষেত্র স্পষ্টতর হল ষাট আর সত্তরের দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর । আমি দেখলাম, জন-বিজ্ঞান আন্দোলনে ঠিকমতো কাজ করতে গেলে দুটো জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমেই আমাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিকতার বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। পদার্থবিদ্যায় পড়াশুনো এবং কিছু বৈজ্ঞানিক কাজের অভিজ্ঞতা এ-ব্যাপারে আমার সাহায্যে এল । এরপর বুঝতে হল বাম আন্দোলনের নানান দিক, যেমন এর বিচ্যুতি এবং সম্ভাবনা --এই দুই দিক-ই। ১৯৭০ সাল থেকে বাম আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকায় কাজটা সহজ হল। ব্যাপারটা একটু বিশদ করা যাক ।

কোনো মধ্যবিত্ত একজন মানুষের পক্ষে প্রগতিশীল জন-বিজ্ঞান আন্দোলনে যোগদানের সবচেয়ে বড় বাধা হল বামপন্থী গোঁড়ামি । এর দুটি উদাহরণ দেব । প্রথমটিকে আমি বলি মার্কসীয় গোঁড়ামি । একদল মনে করে, মার্কসের সর্বশক্তিমান মতবাদ ব্যর্থ হল এঙ্গেল্স-এর মতো অকর্মা তাত্ত্বিক, লেনিনের মতো সুবিধাবাদী রাজনীতিক আর স্ত্যালিনের মতো বর্বর স্বৈরাচারীদের হাতে পড়ে । মার্কসবাদকে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে পারলে তাকে আবার বাঁচানো যাবে, উন্নত করা যাবে এবং তার ভিত্তিতে নতুন এক পৃথিবী তৈরি করা যাবে । --এটা যেন মার্টিন লুথার খ্রিস্টধর্মকে চার্চের দুর্নীতি থেকে বাঁচাতে বাইবেলে ফিরে যাচ্ছেন । হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট মডেলে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের এই দিকটাকে খুব বড় করে দেখানো হয়। অন্য ধরণের গোঁড়ামির নাম দেব বলশেভিক গোঁড়ামি । এর অনেক রকমফের আছে। এই 'বলশেভিক'রা মনে করেন কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টির একমাত্র উপায় হল বীরের মতো সশস্ত্র লড়াই করে রাষ্ট্র শক্তি উৎখাত করা। আমার মত অন্য । আমার মতে, বিশেষ কোনো মতেই ফেরা নয়, -না গান্ধী, না মার্কস, না বেদ বা উপনিষদে ।

আমার বিশ্বাস মধ্যবিত্ত সমস্যার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য আমরা দরিদ্রতম জনসত্তার সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জোট বাঁধার কাজে উদ্যোগী হতে পারি । এই গাঁটছড়া কেমন দাঁড়াবে, আর ভবিষ্যতের সামাজিক গঠন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি কেমন হবে, তা নির্ভর করবে একেবারে নতুন নিয়ম-কানুনের ওপর । সে কাজের বাস্তব-অবাস্তব দিকের আলোচনা আজ থাক । তবে কথাটা চালিয়ে যাবার জন্য কিছু নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি । আমাদের 'উল্টোপ্রদেশের' নাগরিক সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবর্জনা সরানো, আইন-কানুন, সবই দ্রুত ভেঙে পড়ছে। এটা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, সকলে বলছেও । কিন্তু একে এক দিক থেকে আশীর্বাদ মনে হয়েছে আমার, কারণ এর ফলে নব্বই শতাংশ লোকের মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশী স্তরে অন্তত সহৃদয় বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছে । আজকের হাইটেক সমাজে এরকম তৃণমূল স্তরের উদ্যোগকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে মেলানো দরকার। আমাদের সব ভোট ব্যাঙ্ক-ওয়ালা,

এন.জি.ও.-ওয়ালা আর ক্রান্তি-ওয়ালাদের থেকে নিজেদের বাঁচানো দরকার । এই 'আমরা' হলাম স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হারানো সেই মধ্যবিত্তরা যারা নানান দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় জর্জরিত হয়েও গামেরিকান সমাজ ও তার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চাই ।

বিজ্ঞানের দর্শনের নতুন সংশ্লেষ: হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট আধুনিকতার RUDE বিজ্ঞান থেকে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রাকৃতিক দর্শন

আগে আমি পিতা পর্ব থেকে পুত্র পর্বে বিবর্তনের রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি । এখন আমি এর স্বাভাবিক দার্শনিক প্রশ্নগুলি নিয়ে বলব । এই বিবর্তনের আগে বিজ্ঞানের অন্য শাখার ওপরে পদার্থবিদ্যার আধিপত্য প্রায় পুরোপুরি কায়েম হয়ে গিয়েছিল। এই অহমিকাই রাদারফোর্ডোর কথায় প্রতিফলিত হয়েছে, 'কেবল দুই ধরণের বিজ্ঞান আছে -- পদার্থবিজ্ঞান আর ডাকটিকিট সংগ্রহ'। এবার আমার বক্তব্য এই নিউটোনীয় গাণিতিক পদার্থবিদ্যার 'শক্ত' ভিত কী ভাবে নড়ে উঠেছিল ।

এক, গোডেলের ১৯৩১-এর উপপাদ্য ন্যায়শাস্ত্রের খুব বড় কাজ । এর ফলে আরিস্ততলীয় তর্কবিদ্যার একটি বহু প্রচলিত নিয়ম, law of excluded middle বা 'বিনা মধ্যবর্তী নিয়ম', সত্যি কিনা তা নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হল । ঐ নিয়মের ফলে যে কোনো তর্কের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক না ভুল তা বিনা তর্কে জানা যেত । এর সাহায্যেই 'রিডাক্শিও অ্যাড অ্যাবসার্ডাম্' পদ্ধতিতে গণিতের এবং গাণিতিক পদার্থবিদ্যার বহু থিয়োরেম প্রমাণ করা গেছে । কিন্তু গোডেল দেখিয়েছিলেন যে, আরেক ধরণের প্রতিপাদ্য বিষয় ভাবা যেতে পারে যা সত্যি না মিথ্যে তা জানা যাবে না। এর ফলে ডিডাক্টিভ লজিকের উপযোগিতা অনেক কমে গেল ।

দুই, কার্ল পপার তাঁর 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিয়ম' বইটি প্রকাশ করেন ১৯৩৪ সালে । এতে তিনি ইনডাকটিভ লজিক বাতিল করে ভুল প্রমাণ করার নিয়মের উপকারিতা দেখালেন । এই ধাক্কায় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অটল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নড়িয়ে দেওয়া গেল । পপার যে বৈপ্লবিক কথা বললেন তা হল কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়মই সত্য কিনা প্রমাণ করা যাবে না । বৈজ্ঞানিকেরা আসলে যা করেন তা হল তাঁদের কারুর প্রস্তাবিত কোনো উপপাদ্য যে ভুল, তা দেখানো। এর মাধ্যমে পপার দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, 'খাঁটি' বিজ্ঞান, যার মাথা হল পদার্থবিদ্যা, তার কিছু পরিমাণ লজিকাল ভিত রয়েছে। আর ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লক-কে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দিলেন, যদিও সামাজিক স্তরে এই তিনটি বিষয়ে বহু লোকে কাজকর্ম করে থাকেন । ১৯৪৪ সালে তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধী আরও লেখা বার হয়। এই সময়ে আবার সোভিয়েত দেশে নাৎসি আক্রমণের জন্য বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের বাঁচার লড়াই চলছিল ।

তিন, লর্ড কেইন্‌স নিউটনের বিজ্ঞান বহির্ভূত অপ্রকাশিত রচনাগুলি কিনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। তাতে ওগুলি কোনো আমেরিকানের হাতে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় । আর উৎসুক গবেষকরাও তাঁদের ৩০০ বছরের আদর্শ ব্যক্তির অন্য দিকটি দেখার সুযোগ পান । তাঁদের অভ্রান্ত আদর্শপুরুষ যে গণিত ও পদার্থবিদ্যার চাইতে তন্ত্র-মন্ত্র (ম্যাজিক) আর ধর্ম নিয়ে অনেক বেশি লিখেছেন, এটা হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট আধুনিকতার ধারকদের কাছে একটা বিরাট ধাক্কা হিসেবে এসেছিল। অন্যদের কাছে এটা একটা সরল সত্য --'বিজ্ঞান নিজেকে প্রচার করে নিজেদের হিরোদের মাধ্যমে'।

চার, ১৯৩৫-এর EPR paradox (ইপিআর প্যারাডক্স) দিয়ে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যেখানে দুর্বলতা আছে বলে মনে করতেন, তাকে আক্রমণ করলেন । ওই ইপিআর-গবেষণাপত্রের লেখকরা দাবি করলেন বলবিদ্যা স্থানীয় বাস্তবতা নীতি মেনে চলে না। তাঁদের কাছে ওই নীতি বিশ্বের একটি অভ্রান্ত নিয়ম । আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি যে, ফোটন, ইলেকট্রনের মতো কণাদের মিথস্ক্রিয়ার এক অংশ দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় না । তার মানে ফ্রি পার্টিকল, ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম এইসব ক্ষেত্রে নিউটোনীয় বলবিদ্যার মূল তত্ত্ব খাটে না । নিউটনের মতের সার্বজনীনতার বিরুদ্ধে এটা আরেক ধাক্কা ।

পাঁচ, ওয়াটসন ও ক্রিকের হাত ধরে ১৯৫৩ সালে ডিএনএ-র মতবাদ চালু হল । এই অণুর চেহারা খুব সফলভাবে ব্যাখ্যা করে দিল জৈব অনুরা কী ভাবে তৈরি হয়। এর ফলে জীববিদ্যার কিছু তত্ত্ব যেমন জীন ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার হল । আর সেই সঙ্গে প্রজননের মাধ্যমে হেরিডিটির একটা সুন্দর আণবিক ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। তবে এর থেকে জীনবিজ্ঞানীদের মধ্যে কাজের ও সাংস্কৃতিক একটা বড় মাপের ঐক্যমত্যও চালু হল, যাকে কিছু লোক নাম দিয়েছেন 'সবই জীন-এ আছে' এই মতবাদ । এই রিডাকশনিস্ট আণবিক জীববিদ্যার ধারণাই কোটি কোটি টাকার জেনেটিক কারিগরির জন্ম দিয়েছে । এই বাড়াবাড়ি থেকেই জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে স্পষ্টত দুটি ভাগ দেখা দিয়েছে । --

একটি রিডাকশনিস্ট ধারা যেখানে রয়েছেন ডকিন্স, উইলসন প্রমুখরা, আরেকটি ক্রিয়াশীল বিবর্তনবাদী ধারা যেখানে আছেন বা ছিলেন স্টিফেন জে গুল্ড, আর্নস্ট মেয়ার, আর লেভিন্স, আর লেভস্তিন প্রভৃতিরা ।
এখানে কিছু ঘটনা ও প্রক্রিয়া বলা হয়েছে যাতে পিতৃ-পর্ব থেকে পুত্র-পর্বে বিবর্তনের প্রকার ও গভীরতা বোঝা যায় । এখন আমি মেয়ার, কুন ও কনিষ্ঠ বার্নালের কাজ আলোচনা করে দেখাব যে, এর থেকে কীভাবে পুত্র পর্বে বৈজ্ঞানিক মনন ক্রিয়া চলেছে ।
বিজ্ঞানের পুরনো দর্শন সম্বন্ধে মেয়ারের বিরক্তির প্রকাশ, বিশেষ করে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে, তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক (১৯৯৭): 'ক্ল্যাসিকাল জড় বিজ্ঞান, যার ওপর ক্ল্যাসিকাল বিজ্ঞানের দর্শন নির্ভর করে, এমন কিছু ধারণার বশবর্তী ছিল যেগুলি জীবনকে বর্ণনা করার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, যেমন, এসেন্সিয়ালিজম, ডিটারমিনিজম, ইউনিভার্সালিজম, আর রিডাকশনিজম্ । জীববিদ্যা যদি ঠিকমতো বোঝা যায়, দেখা যাবে তার মধ্যে রয়েছে লোকজনকে নিয়ে চিন্তা করা, সম্ভাবনার তত্ত্ব, বহু মতবাদ, হয়ে ওঠা বা বিবর্তন আর ঐতিহাসিক তথ্যের গুরুত্ব। যেটার দরকার ছিল তা হল বিজ্ঞানের এক নতুন দর্শন যা সবরকম বিজ্ঞানকেই নিজের আওতায় নিতে পারে --পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, সবই .....।'

এই রিডাকশনিজম, ইউনিভার্সালিজম, ডিটারমিনিজম্ ও এসেন্সিয়ালিজম্ যেগুলিকে মেয়ার বলেছেন ক্ল্যাসিকাল বিজ্ঞান দর্শনের সব চেয়ে বড় লক্ষণ, সেগুলির প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে আমি RUDE শব্দটি তৈরি করেছি । রুড (RUDE) মানে রূঢ়। এই RUDE-বিজ্ঞান হল হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট গামেরিকান ধারার ধর্ম, আর এর বিপরীতে মেয়ার যে লক্ষণগুলির কথা বলেছেন অর্থাৎ লোকজন নিয়ে চিন্তা, ইত্যাদি সেগুলি ওই RUDE-এর বিপরীত ধারা ।
বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে কুনের কাজ বিখ্যাত। এখানে তাঁর কাজের একটা দিক আমি দেখাতে চাই যেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে । তা হল যে কোনো সময়ে সঠিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হল একদল বিশেষজ্ঞের সন্মিলিত ধারণা । এর ফলে হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট মডেলের সত্যের নিরপেক্ষতা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ওই মডেল থেকে শক্তিশালী পজিটিভিস্ট মডেল বার হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তি-সাপেক্ষ সত্য মানে অবশ্যই স্বৈরাচারী স্বাধীনতা নয়, অর্থাৎ 'সবই সম্ভব'-গোছের মতবাদ একেবারেই ঠিক নয় । সঠিক রাস্তা হল ব্যক্তি সাপেক্ষ আর ব্যক্তি নিরপেক্ষ বীক্ষণের জটিল দ্বন্দ্বের নিরসন, যা অনেকটাই বাস্তব অবস্থা নির্ভর । এই সমস্যার সমাধান হলে তা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে ।
এবার কনিষ্ঠ বার্নালরের কাজের দিক নিয়ে আলোচনা করব। একটি বিষয় উনি তাঁর বইতে জোর দিয়েছেন । বলেছেন তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কে বিশেষজ্ঞ মহলের অনীহার কথা। এটা কিছুটা খোলামনের অভাবের কারণে, কিছুটা প্রফেসনাল জড়তার কারণে, কিছুটা আনকোরা একজনের নতুন তত্ত্ব মেনে নেওয়ায় অসুবিধের কারণে । কনিষ্ঠ বার্নাল তাঁর বইতে আসলে ঊনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী ভিক্টোরীয় যুগের পাতি বস্তাপচা জাতিবৈরিতা বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ।
আগের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে দিল্লী এখনও দূর অস্ত্ । আমি তাকিয়ে আছি বিকল্প সেই পথের দিকে কখন পরিবর্তনের ভাষা ও পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্বমূলক লৌকিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে ।

উপসংহার

প্রগতিশীল জন-বিজ্ঞান আন্দোলনের কথা বলে আমি এবার শেষ করতে চাই । এখন প্রয়োজন হল বৈজ্ঞানিক আধুনিকতাকে আমাদের সমাজে মেলানো। আগে আমি বলেছিলাম যে, এই আধুনিকতা দুরকম -হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট আর বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব ধরণের । দুটিই অনেকদিনকার এবং দুটিই শক্তিশালী। কিন্তু প্রথমটির পেছনে আছে সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রশস্ত্র। এই কথাটাই খোলাখুলি ভাবে বলেছেন হামফ্রি ডেভি, যা উদ্ধৃত করা হয়েছে একেবারে প্রথমে । ১৫০ বছর আগে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়েছে। এখন নতুন হাইব্রিড আধুনিকতার পক্ষে পুরনো আধুনিকতার ধারার সঙ্গে মিশে যাওয়া শক্ত। কিছুদিন আগের নেহরুপন্থী মত আর হিন্দুত্ববাদী মত হল নতুন হাইব্রিড ধারার দুটি নমুনা। আমার পুরো আলোচনা কেবল হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট আর বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব ধারাকে নিয়েই হয়েছে । সাধারণ ভাবে, বৈজ্ঞানিক আধুনিকতা প্রকৃতিকে পাল্টে দিতে চায় আমাদের সুবিধার জন্য। বিজ্ঞানের কাজে সবচেয়ে বড় সাহায্য আসে আরও শক্তিশালী টেকনোলজি তৈরির ক্ষমতা থেকে । মিলিটারি আর ভোগবাদী টেকনোলজির আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা হল এই হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট আধুনিকতার ফল ।
উল্টোদিকে, বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব ধারায় বেশির ভাগ লোকের ভালোর কথা চিন্তা করা হয় । তার নজর হল জীবনের সব ক্ষেত্রে সবাইকে নিয়ে চলা । এর জন্য তাকে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়। দুঃখের বিষয়,

এই ধরণের পরিবর্তনের একটা সরল চিত্র অর্থাৎ কেবল সশস্ত্র রাজনৈতিক বিপ্লবের চিত্রের-ই প্রচার পেয়েছে, যা অনেক ক্ষতি করেছে আমাদের ।

পরিবর্তন দু'ভাবে হয়। ক্রমান্বয়ে অথবা ধাপে ধাপে হঠাৎ হঠাৎ । হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার আধুনিকতা পদার্থবিদ্যার অনুসারী ক্রমান্বয় পরিবর্তনের পথ ধরে হয় । ফলে তার কাছে ওইরকম ধাপে ধাপে হঠাৎ পরিবর্তন অবাঞ্ছিত মনে হতেই পারে । অন্যদিকে বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব ধারায় ধাপে ধাপে হঠাৎ পরিবর্তন স্বীকৃত সত্য । তবে আশ্বাসের কথা এই যে, বিশ শতকে এই ধাপে ধাপে হঠাৎ পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ পাওয়া গেছে। যেমন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর কমপিউটার প্রযুক্তি । এর ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধারণ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু এখনও বিশ্বায়িত কমিউনিস্ট বিপ্লব মেনে নেন অল্প সংখ্যক মানুষ। অতএব সকলকে এই পথে আসতে দেখা এখনও ঢের ঢের দেরি ।

আশার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করার জন্য আমি পাঞ্জাবের শহিদ পাশের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি ।

কোথা থেকে এই যাত্রা শুরু
কোথায় বা এর শেষ
কেমন সে জায়গা
কিংবা আরও কোনো প্রশ্ন
কোনো তার্কিককে গিয়ে জিজ্ঞেস করো ।
আমি এক দেহাতি মুসাফির
কেবল একথাই বলতে পারি যে সফরের শব্দকোষে
বিদায় বলে কোনো শব্দ নেই,
সফরে ব্যথা বেদনার কোনো বালাই নেই,
মৃত্যু বলে থেমে যাওয়া নেই,
আর গন্তব্যস্থান বলে কিছু হয় না ।

অভিশাপ আশীর্বাদে রূপান্তরিত হল : যাদুর নাম উন্নয়ন

সুমিত চক্রবর্তী

কদিন আগে একটা নাটকে দেখেছিলাম -- কোন এক দেবস্থানে দু'জন ঝগড়া করছে। --একজন কুঁজো অন্যজন অন্ধ। ঝগড়া করতে করতে অন্ধ কুঁজোর পেছনে একটি লাথি মারে এবং কুঁজোও রাগের চোটে অন্ধের চোখে মুখে মাটি ছুঁড়ে মারে। অবাক হয়ে তারা দেখে কুঁজোর কুঁজ সেরে গেছে, অন্ধও দুচোখেই দেখতে পাচ্ছে। উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতি করা, কিন্তু উল্টে লাভ হল। দেবস্থানের এমনই মহিমা। সভ্যতার বিকাশও যেন অনেকটা এরকমই এক ম্যাজিকের গল্প।

রেল এদেশে চালু হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার জন্য। লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নয়। তার ফলে বন্যা এবং ম্যালেরিয়া মহামারির বিকাশ হল । চাষিরা বঞ্চিত হল পলিমাটির সার থেকে।

চা চাষের প্রথম যুগে আরকাঠিরা নানা জায়গা থেকে মানুষদের ফুসলে নিয়ে যেত চা বাগানে কাজ করার জন্য। গান আছে 'হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম।' আজ তো চা বাগান মালিকরা উল্টে শ্রমিকদের তাড়াতে চাইছে।

শুরু যে কারণেই হোক আর যে ভাবেই হোক আজ রেল বা চা আমাদের জীবনে কিভাবে যেন অতি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য হয়ে গেছে। বোঝাই যায়নি রুমাল কখন বেড়াল হয়ে গেল। যে কোনো নতুন বিকাশ বা নির্মাণ, সে বাঁধ তৈরি, কারখানা তৈরি, খনি খনন, সেতু বা রাস্তা তৈরি --উদ্দেশ্য তার ঠিক কারো ক্ষতি করা না বরং কর্মকর্তার লাভ বা মুনাফা। যে কোনো নতুন পণ্য বাজারে আসে সে দেড় দু'শ বছর আগের চা বা হালের কম্পিউটার মোবাইল বা ঠান্ডা পানীয় যাই হোক না কেন, তা এসেছে কিছু মানুষের বা একটি শ্রেণীর মুনাফার জন্য। এগুলি এলে মানুষের খুব সুবিধে হবে ভেবে এগুলি করেনি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুরুর সময়টা বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই। তারা উদ্বাস্তু হয় বা বেকার হয়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সরকারী-বেসরকারী ঠেঙারেদের হাতে মার খায় নিহত হয়।

আজ যদি কাউকে বলি তুমি গাড়ি বা ধোলাই যন্ত্র কিনো না, ঠান্ডা পানীয় খেয়ো না, সে বলবে আমি কিনবো কিনা আমিই ঠিক করবো। এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। অথচ যারা খনি খনন বা নির্মাণ কার্যের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে যায় তারা তাদের লড়াইয়ে সফল হলে এই বাজারি গণতন্ত্র তৈরিই হতে পারতো না। এই বাজারি গণতন্ত্রের মধ্যে একবার এনে ফেলতে পারলেই --ব্যস, সবকিছু বৈধ হয়ে যায়। কারণ অত্যাচারির মুখ ধুসর হতে হতে তখন আর চেনা যায় না। কিন্তু বাজারি গণতন্ত্রের মধ্যে আসার আগেই সেখানে প্রতিনিয়ত চলে ভয় দেখানো, নির্যাতন, হত্যার মত বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া। একটার পর একটা মিথ্যে মামলা সাজিয়ে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলে আন্দোলনকারিদের। এখানে প্রচার মাধ্যম পৌঁছয় না। শিল্পপতি-সংবাদমাধ্যম, সরকার-রাজনৈতিক দল মিলে সেখানে চলে এক অন্যরকম খেলা।

উড়িষ্যার লাঞ্জিগড়ে মানুষজনকে তাড়িয়ে দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের জন্য খনি কারখানা নির্মাণ কাজ চলছে। সেখানে কাজের ডাক এল ঘটনাচক্রে আমাদের বাড়িতেই। ইঞ্জিনীয়ার চাই। ভাইকে বলি এদের আন্দোলনের কথা। বলি এখানে কাজ করা মানে ওখানকার মানুষের ক্ষতি করা। তাদের আন্দোলনকে দুর্বল করা। এসব কথায় কোন জোর থাকে না শেষ পর্যন্ত -- কোন না কোন ভাবে তো আমরা বেশীর ভাগ লোকই ক্রমশঃ বৈধ হয়ে ওঠা ক্ষেত্রে করে কর্মে খাচ্ছি। কেউ সুন্দর পাথরে ঘরের মেঝে সাজালে আমরা তো তার রুচির প্রশংসাই করি। আমরা তো ভাবি না পাথর খাদানের পীড়নের কাহিনী।

এখন একটা গল্প বলি। এক জনসভায় এক বিজ্ঞানী জানালেন তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সে যন্ত্রের এমন গুণ যে এক ঘন্টার কাজ পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। মানুষের সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। তবে সমস্যা একটাই --আমাদের একশো কোটি মানুষের দেশে চালু করলে এই যন্ত্র বছরে তিন লক্ষ লোকের জীবন নেবে। 'যদি আপনারা এটুকু মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন আমরা এক্ষুণি এই যন্ত্রের সুবিধা নিতে পারি'। জনসভার লোক সমস্বরে বলল, 'তা কি করে হবে, যত সুবিধাই হোক তার জন্য যদি বছরে তিন লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয় সে যন্ত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি না'। তখন বিজ্ঞানী জানালেন 'সে যন্ত্র তো ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে'। জনতা জানতে চাইল, কি সেই যন্ত্র? তিনি জানালেন --'মোটরগাড়ী'। সরকারী হিসাব মতে ভারতে পথ দুর্ঘটনায় বছরে তিন লক্ষ লোক মারা যায়।

আমাদের সমস্ত উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত এই মোটরগাড়ির গল্প নয় তো?

শিল্প, সত্য ও রাজনীতি

হ্যারল্ড পিন্টার

(ডিসেম্বর ৭, ২০০৫-এ দেওয়া নোবেল-বক্তৃতার অংশ-বিশেষের ভাবানুবাদ)

১৯৫৮ সালে আমি লিখেছিলাম, --"বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ভেদরেখা নেই, যেমন নেই সত্য আর মিথ্যার মধ্যেও । কোনো কিছু আবশ্যিকভাবে সত্য বা মিথ্যা এমনটা নাও হতে পারে । এটি একই সঙ্গে সত্য এবং মিথ্যা দুই-ই হতে পারে ।"

আমি এখনও বিশ্বাস করি এই কথাগুলো যথেষ্ট অর্থবহ এবং শিল্পের মধ্য দিয়ে যে বাস্তবতায় আমরা পৌছতে পারি সে ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যায় । একজন সাহিত্যিক হিসেবে এই কথাগুলি আমি সমর্থন করলেও একজন নাগরিক হিসেবে পারি না । একজন নাগরিক হিসেবে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হয় সত্য কোনটা, মিথ্যে কোনটা ।

নাটকে সত্য ছলনাময়ী । তাকে কখনই পাওয়া যায় না । কিন্তু তাকে সন্ধান করে যেতে হবে । এই খোঁজই একজন শিল্পীর উদ্যম ও প্রয়াসকে চালিত করে । এই খোঁজই তার কর্তব্য । কতবার অন্ধকারে সত্যের ওপর হোঁচট খেতে হয়, ধাক্কা খেতে হয়, বা কোনো চিত্রকল্প কিংবা আকারের ঝলক দেখে সত্য বলে অনুমান হয় এবং এসবই হয় প্রায় না বুঝেই । কিন্তু আসল সত্য এই যে, নাট্যশিল্পে এক সত্য বলে কোনো কিছু হয় না । তারা সংখ্যায় অনেক । এইসব সত্যেরা একে অন্যের প্রতি অন্ধ --তারা একে অন্যের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, তারা একে অন্যের থেকে সরে আসে, একে অন্যকে প্রতিবিম্বিত করে, একে অন্যকে উত্যক্ত করে, উত্তেজিত করে । কখনও অনুভব হয় মুহূর্তের জন্য সত্য এসে ধরা দিয়েছে, কিন্তু সেই সত্য কখন হাত ফসকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় ।

রাজনীতিবিদ্‌রা যেভাবে রাজনৈতিক-ভাষা ব্যবহার করে তাতে এমন সব কিছু হয় না । যতটা প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে দেখেছি আধিকাংশ রাজনীতিবিদ সত্যে আগ্রহী নন । তারা আগ্রহী ক্ষমতায় । এই ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য জনগণকে সব সময়েই রেখে দিতে হয় অজ্ঞতায় । জনগণ এই ভাবেই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায় । জনগণের চারপাশে এক বর্ণময় মিথ্যার বুনোটের মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকা ।

(এখানে উপস্থিত) প্রতিটি মানুষ-ই জানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হানাদারির যৌক্তিকতা হিসেবে বলেছিল, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণধ্বংসকারী এমন সব ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে যার কোনো কোনোটি ৪৫ মিনিটেই পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংস ডেকে আনতে পারে । এটি সত্য বলে আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল, কিন্তু এটা সত্য ছিল না । আমাদের বলা হয়েছিল ইরাকের সাথে আল্‌কায়দার সম্পর্ক রয়েছে । ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর নৃশংস ধ্বংসে ইরাকেরও দায়িত্ব আছে । আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল এটা সত্য । কিন্তু এটাও সত্য ছিল না । আমাদের বলা হয়েছিল বিশ্বের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইরাক একটি ভীতিকর অস্তিত্ব । আমাদের সুনিশ্চিত করা হয়েছিল এটা সত্য । তবু এটা সত্য ছিল না ।

সত্য সম্পূর্ণ অন্য রকম । সত্য নির্ভর করছে, আমেরিকা বিশ্বের সম্পর্কে কী ভাবছে এবং কী ভূমিকা গ্রহণ করছে, তার ওপর ।

এই বিষয়টি আলোচনার আগে আমি তাকাতে চাই নিকট অতীতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার বিদেশনীতির দিকে ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কী ঘটেছিল তা সবাই জানে । সুপরিকল্পিত নৃশংসতা, ব্যাপক নিষ্ঠুরতা, স্বাধীন মতামতকে নিদারুণভাবে দমন । এর সমস্ত কিছুই যথেষ্ট তথ্যসহযোগে প্রমাণিত ।

আমি বলতে চাইছি যে, এই সময়ে আমেরিকার অপরাধগুলির যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণাদিই নেই । এই ভয়ঙ্কর অপরাধগুলি সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদির এমনই অভাব যে এগুলিকে অপরাধ বলেই গণ্য করা হয় না । কিন্তু এইগুলিকেই আমাদের আলোচনার বিষয় করতে হবে । আজকের পৃথিবী যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে এইসব ঘটনার বিশেষ ভূমিকা আছে । সোভিয়েত রাশিয়ার উপস্থিতিতে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হলেও, আমেরিকার অব্যাহত এই সব কার্যকলাপ তাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করেছে, --যা সে চেয়েছিল । এক সময় সার্বভৌম রাষ্ট্রে সরাসরি আগ্রাসন আমেরিকার পছন্দের বিষয় ছিল না । আমেরিকার পছন্দ ছিল 'Low intensity conflict', অর্থাৎ ধীরে ধীরে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু । --একটি মাত্র বোমার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে নয় । প্রথমে একটি দেশের হৃদপিন্ডকে সংক্রামিত করা । তারপর দেখানো যে, সেখানে মারণ-ব্যাধির জন্ম হয়েছে । যার ফলে তীব্র রোগ যন্ত্রণায় দেশের মানুষ মুমূর্ষ ও পরাভূত । কর্পোরেট ও সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় বসল । আর ঠিক তখনই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলা, এবার গণতন্ত্র রক্ষিত হল ।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় আমেরিকার বিদেশ নীতি এরকমই ছিল । নিকারাগুয়ার ট্র্যাজেডি, অতীত ও বর্তমান পৃথিববীতে আমেরিকার ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ।

আশির দশকের শেষের দিকে লণ্ডনে আমেরিকার দূতাবাসে একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম । সেই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল নিকারাগুয়া সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 'কন্ট্রা'কে আরও অর্থ দেওয়া হবে কিনা । নিকারাগুয়া সরকারের হয়ে বলার জন্য আমি প্রতিনিধিত্ব করছিলাম । এই দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূণর সদস্য ছিলেন ফাদার জন মেটকাফ । আমেরিকার পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রেমন্ড সিৎজ্ (তৎকালে দূতাবাসে সর্বোচ্চ পদাধিকারী পদের পরেই যিনি ছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত হন) । ফাদার মেটকাফ জানালেন, তিনি একটি গির্জার দায়িত্বপ্রাপ্ত । গির্জার নিয়ন্ত্রণে একটি বিদ্যালয়, একটি হাসপাতাল এবং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে । সেখানে তারা শান্তিতেই বসবাস করছিলেন । কিন্তু কয়েকমাস আগে কন্ট্রাবাহিনী তাদের গির্জা, গির্জা সন্নিহিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয় । নার্স এবং শিক্ষিকাদের ধর্ষণ করে এবং চিকিৎসকদের নিষ্ঠুরতম উপায়ে হত্যা করা হয় । তারা বর্বরদের মতো ব্যবহার করে । তিনি দাবি জানান, যাতে আমেরিকার সরকার এই সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে অর্থ সাহায্য না করে ।

রেমন্ড সিৎজ্ যুক্তিবান, দায়িত্বশীল এবং উচ্চস্তরের পরিশীলিত মানুষ হিসেবে খ্যাত । কূটনৈতিক মহলেও ইনি খুবই সম্মানিত । তিনি শুনলেন, থামলেন এবং অবশেষে গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, 'ফাদার, আপনাকে আমি বলতে চাই যুদ্ধে নিরীহ মানুষরাই সবসময়ে পীড়িত হয়, কষ্ট ভোগ করে ।' চারিদিকে জমাট নিস্তব্ধতা । আমরা নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম । তার মধ্যে কোনো কুণ্ঠার আভাস ছিল না । নিরীহ মানুষ সত্যিই চিরকালই দুর্ভাগ্যের শিকার । অবশেষে কেউ একজন বললেন যে, এই ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষেরা এমন সব সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে যা আপনার সরকারেরই আর্থিক মদতপুষ্ট । যদি কংগ্রেস 'কন্ট্রা'কে আরও অর্থ দেয়, সেক্ষেত্রে এই জাতীয় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের ঘটনা আরও ঘটবে । আপনার সরকার কী একটি সার্বভৌম দেশের স্বাধীন নাগরিকদের ধ্বংস এবং হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় ? সিৎজ্ নির্বিকার, অবিচল । বললেন, 'আপনার সাথে আমি সহমত নই ।'

আমরা যখন দূতাবাস ছেড়ে যাচ্ছি, একজন আমেরিকান মুখপাত্র আমাকে বললেন, 'আপনার নাটক আমার পছন্দ ।' তখন আমি কিছু বলি নি।

প্রসিডেন্ট রেগনের একিটি বিবৃতি আমি মনে করাতে চাই, -'কন্ট্রারা আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বসূরিদের সমগোত্রীয় ।' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়াতে ৪০ বছর ধরে সমোজার নিষ্ঠুর একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করে আসছিল । নিকারাগুয়ার জনগণ সান্দিনিস্তার নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে এই একনায়কতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে দেয় । এটি একটি রোমাঞ্চকর জনবিপ্লব ।

সান্দিনিস্তারা নিখুঁত ছিল এমন বলছি না । তাদের অনেক গোঁয়ার্তুমি ছিল, রাজনৈতিক দর্শনে অনেক স্ব-বিরোধিতা ছিল । কিন্তু তাঁরা ছিল বুদ্ধিমান, যুক্তিশীল ও সভ্য । তাঁরা একটি স্থায়ী, বহুত্ববাদী, সুন্দর সমাজ স্থাপন করতে ব্রতী হয়েছিল । ওরা মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করে । লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিপীড়িত চাষি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল । লক্ষাধিক পরিবারকে জমির মালিকানা দেয় । দুহাজার বিদ্যালয় স্থাপন করে । উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাক্ষরতার অভিযান দেশের নিরক্ষরতাকে কমিয়ে আনে এক-সপ্তাংশেরও নীচে । অবৈতনিক শিক্ষা এবং নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করে । শিশু মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশ কমে যায় । পোলিও দূরীভূত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্ত কৃতিত্বকে মার্কসবাদী ষড়যন্ত্র বলে নিন্দা করল । আমেরিকা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা একটা বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত । নিকারাগুয়া সরকার যদি আর্থ-সামাজিক ন্যায়, উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সামাজিক ঐক্য ও জাতীয় আত্মমর্যাদা স্থাপনে সমর্থ হয় তবে প্রতিবেশী দেশগুলি একই দিকে এগোবে । মনে রাখতে হবে, এটা এমন সময় ঘটছে যখন এল্ সালভাদরে আমেরিকার মদতপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে ।

রেগন নিকারাগুয়াকে টোটালিটারিয়ান অন্ধকূপ বলে বর্ণনা করেছিলেন । এই মতামতটিকে মিডিয়া একটি সাধারণ সত্য হিসেবে গ্রহণ করল । ব্রিটিশ সরকারও এই মতামতটিকে সঠিক ও ন্যায্য মন্তব্য হিসেবে গ্রহণ করল । কিন্তু ঘটনা হল এই যে, নিকারাগুয়া সরকারের কোনো ঘাতক বাহিনী ছিল না । ছিল না কোনো সুপরিকল্পিত সামরিক নিষ্ঠুরতা । কোনো যাজক নিহত হন নি । নিকারাগুয়া সরকারে দুজন জেসুইট এবং একজন মেরিনল মিশনারির যাজক ছিল । প্রকৃতপক্ষে টোটালিটারিয়ান অন্ধকূপ ছিল পার্শ্ববর্তী দুটি রাষ্ট্র, এল্ সালভাদর ও গুয়াতেমালা । ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং আনুমানিক প্রায় দুই লক্ষের মতো মানুষ এই সামরিক জুন্টার শাসনের শিকার হয় ।

১৯৮৯ সালে ৬ জন পৃথিবীখ্যাত জেসুইট যাজককে হত্যা করা হয় এল্ সালভাদরের সেন্ট্রাল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিঙে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যালকাট্‌ল্ রেজিমেন্ট (Alcatl regiment) এঁদের হত্যা করে । নির্ভীক মানুষ আর্চবিশপ রোমারিওকে হত্যা করা হয় প্রার্থনাসভায় । প্রায় ৭৫,০০০ মানুষ নিহত হয় এই সময় । কেন তাদের হত্যা করা হয়েছিল ? --কারণ তারা বিশ্বাস করত একটা উন্নততর জীবনে উত্তরণ সম্ভব এবং তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত । এই বিশ্বাসই তাদের কম্যুনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছিল । তারা মারা গিয়েছিল

কেননা তারা সেই স্থিতাবস্থাকে প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছিল, যেই স্থিতাবস্থায় তারা পেয়েছে দারিদ্র্য, অসুস্থতা, নৈতিক অধঃপতন, অত্যাচার ।

শেষপর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তা সরকারের পতন ঘটায় । এটা ঘটতে বেশ কিছু সময় লাগে, কিছু প্রতিরোধের ঘটনাও ঘটে । নিরন্তর নিষ্করুণ অর্থনৈতিক চাপ এবং ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু কার্যত নিকারাগুয়ার মানুষের মনোবল ভেঙে দেয়।

আবার তারা ফিরে গেল দারিদ্র্যের কবলে, ফিরে এল ক্যাসিনো । বিনামূল্যে শিক্ষা এবং চিকিৎসা উঠে গেল । বৃহৎ পুঁজি ফিরে এল তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে । প্রতিষ্ঠিত হল গণতন্ত্র !

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি শুধু মধ্য আমেরিকায় নয়, সমগ্র পৃথিবীজুড়েই এই নীতির প্রয়োগ চলতে থাকে । এ যেন এক নিরন্তর প্রক্রিয়া । এবং প্রতিবারই ঘটার পর মনে হয় যেন কখনওই ঘটেনি ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী প্রতিটি দক্ষিণপন্থী সামরিক একনায়কতন্ত্রকে শুধু সমর্থন করেছে তাই নয়, অনেক সময় সেই একনায়কতন্ত্রের জন্মও দিয়েছে । আমি এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, গ্রিস, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, হাইতি, ফিলিপিন্স, গুয়াতেমালা, এল্ সালভাদর এবং অবশ্যই চিলির কথা বলতে চাই । যে বিভীষিকা, বর্বরতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩ সালে চিলিতে নামিয়ে এনেছিল, তা কখনও মুছে ফেলা যাবে না । কোনো দিনই ক্ষমা করা যাবে না ।

এই সমস্ত দেশে শত সহস্র হত্যা হয়েছে । কখনো কী এই সব ঘটনা ঘটেছে ? সমস্ত ক্ষেত্রেই কী এর জন্য আমেরিকার বিদেশ নীতিই দায়ী ? দুটি প্রশ্নেরই উত্তর হল, হ্যাঁ । এই সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে । এবং এই সমস্তই আমেরিকার বিদেশনীতির পরিণাম । কিন্তু আপনারা এসব জানেন না । যখন এসব ঘটছে তখনও জানবেন না । যেন কিছুই ঘটে নি মনে হবে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ সুপরিকল্পিত, নিরন্তর, ঘৃণিত, অনুতাপহীন । কিন্তু খুব কম মানুষই এইসব নিয়ে কথা বলে । সারা বিশ্বে আমেরিকা তার ক্ষমতাকে এমন চতুরতা ও নিস্পৃহতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে যে, মনে হয়েছে বিশ্বে এরাই বুঝি শুভশক্তি ।

সেল্সম্যান হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনন্য । আত্মপ্রেমকে পণ্য হিসেবে চালানোয় সব থেকে সফল । আমেরিকার যে কোনো প্রেসিডেন্টের টেলিভিশন বক্তৃতা শুনুন সেখানে নানাভাবে 'আমেরিকার মানুষ' শব্দটি শুনবেন । শুনবেন তারা সব সময়ই বলছেন, 'আমি আমেরিকার মানুষদের বলছি এটা প্রর্থনার সময় এবং আমেরিকার মানুষদের অধিকার রক্ষা করতে বলছি । বলছি তাদের প্রসিডেন্টকে বিশ্বাস করতে, সে যে কাজ করতে যাচ্ছে তা আমেরিকার জনগণের হয়েই করছে ।'

এটি একটি কৌশল । ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে ভাবনা দূরে সরে থাকে । এই শব্দবন্ধগুলি আমেরিকার মানুষকে দিয়েছে এক ধরণের নিশ্চিন্ততার আশ্রয় । যেখানে থেকে আর কোনো ভাবনার প্রয়োজন নেই । সেই নরম আশ্রয়ে এলিয়ে থাকুন । এই আশ্রয় আপনার প্রজ্ঞা, সমালোচক মন, এমন সব কিছুকে দম আটকে মারতে পারে । এবং এটা বেশ আরামদায়ক অবস্থা সন্দেহ নেই । তবে তা মোটেই আরামদায়ক নয় সেই ৪ কোটি মানুষের কাছে, যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে আছেন অথবা সেই কুড়ি লক্ষ মানুষের কাছে যারা বন্দি হয়ে রয়েছে সারা আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশাল বিশাল কারাগারের অন্ধকারে ।

এখন আর আমেরিকা 'লো ইনটেনসিটি কনফ্লিক্ট'-এর পরোয়া করে না । আমেরিকাকে এখন আর গোপনীয়তা বা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় না, এখন সে টেবিলে তাস দেখিয়েই খেলতে ভালবাসে । কোনো ভয়ও নেই । সমর্থনেরও দরকার নেই । ইউনাইটেড নেশনকে আর তার পাত্তা দেবার কথা ভাবতে হয় না । পাত্তা দেয় না আন্তর্জাতিক আইন অথবা ভিন্নমতের সমালোচনাকে । এগুলিকে এখন সে পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ ও অপ্রয়োজনীয় কাজ বলে ভাবে । তাদের একটা পোষা ছোট্ট ভেড়া আছে, তার নাম --গ্রেট ব্রিটেন ।

আমাদের নৈতিকতা সংবেদনশীলতা এসব কোথায় গেল ? কোনোদিন কী ছিল ? এইসব কথার অর্থ কী ? বিবেক, এটা কী অব্যবহৃত শব্দই হয়ে গেল ? এই বিবেকবোধ শুধু নিজের কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্যের কাজের প্রসঙ্গে নিজের ভূমিকা স্থির করতে ভীষণ ভাবে প্রয়োজন । এইসব ভাবনা কি মরে গেল ? তাকান গুয়ানতানামো বে-র দিকে । শত শত মানুষ কোনো অভিযোগ ছাড়াই তিন বছর ধরে আটক । কোনো আইনি সাহায্য ছাড়া এরা কার্যত চিরকালের জন্য বন্দি । জেনেভা কনভেনশনকে তোয়াক্কা না করেই এই বেআইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে । ইন্টারন্যাশানাল কমিউনিটি এই সমস্ত বিষয় শুধু সহ্যই করছে না, এই সব ব্যাপারে তারা চিন্তাই করে না । এই সমস্ত অপরাধ সংগঠিত করছে এমন একটি রাষ্ট্র যে নিজেকে মুক্ত দুনিয়ার নেতা বলে দাবি করে । আমরা কী গুয়ানতানামো বে-র অধিবাসীদের কথা ভেবে দেখেছি ? তাদের সম্পর্কে মিডিয়া কি বলছে ? মাঝে মাঝে দুলাইনের খবর উঁকি মারে ছয়ের পাতার কোথাও । আমেরিকার এইসব অপরাধের বিরুদ্ধে বর্তমানে সেখানে অনশন ধর্মঘট চলছে । অনেককেই জোর করা খাওয়ানো হচ্ছে । এর মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকরাও আছে । অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই জোর করে নাক দিয়ে গলা অবধি টিউব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাতে রক্ত বমি হচ্ছে । এটা অত্যাচার । ব্রিটিশ বিদেশ সচিব এই সম্পর্কে কী বলছে ? কিছুই না ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কি বলছে ? কিছুই না । কেন ? কারণ আমেরিকা বলেছে 'গুয়ানতানামো বে সম্পর্কে সমালোচনা করা বন্ধুত্বমূলক কাজ নয় । হয় তুমি আমার দিকে, নয় তো আমার বিরুদ্ধে ।' সুতরাং ব্লেয়ার চুপ ।
ইরাক আক্রমণ একটি দস্যুসুলভ কাজ । নির্লজ্জ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস । আন্তর্জাতিক আইনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । এটি একটি সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত যুদ্ধ । যুদ্ধের যুক্তি সাজানো হয়েছে অগণন মিথ্যার ওপরে, মিডিয়ার ব্যাপক কারচুপির ওপরে । এই সমস্ত কিছু জনগণকে সুকৌশলে যুদ্ধের পক্ষে এনেছিল । এই কাজ সংগঠিত হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করতে । যখন সমস্ত ন্যায্যতাই ব্যর্থ হল, তখন শেষ অজুহাত হিসেবে এল স্বাধীনতার যুক্তি । সামরিক বাহিনীর ভয়ঙ্কর শক্তি প্রদর্শনের ফল হল হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু, অঙ্গহানি ।
আমরা ইরাকি মানুষদের জন্য নিয়ে এসেছি অত্যাচার, ক্লাস্টার বোমা, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম, অসংখ্য যথেচ্ছে হত্যা, অধঃপতন এবং মৃত্যু । এরপর ঘোষণা করছি, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আনছি গণতন্ত্র ও মুক্তি !
কতজন মানুষ মারলে পরে একজনকে গণহত্যাকারী ও যুদ্ধোপরাধী বলা যায় । এক লক্ষ ? আমার মনে হয় যথেষ্ঠ । সুতরাং বুশ এবং ব্লেয়ারকে আন্তর্জাতিক বিচারশালায় অভিযুক্ত করা যায় ।
মৃত্যুর কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক । যদিও এখানে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু যেন এরা কোনোদিন ছিলই না, আমেরিকার বোমা ও মিসাইলে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটলেও, তাদের মৃত্যু অস্তিত্বহীন, তারা মৃত হিসেবে নথিভুক্ত নয় । আমেরিকার জেনারেল টমি ফ্র্যাঙ্ক বলেছেন, 'আমরা শরীর গুনি না' ।
আমি আগেই বলেছি আমেরিকা এখন খোলাখুলি টেবিলের ওপর তাস ফেলে খেলছে । এখন আমেরিকার ঘোষিত সরকারি নীতি 'সর্বাত্মক কর্তৃত্ব', --এটা ওদেরই শব্দবন্ধ । সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অর্থ মাটি, সমুদ্র, আকাশ, মহাকাশ, আনুষঙ্গিক সমস্ত সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব ।
আমেরিকার বর্তমানে ১৩২টি দেশে ৭০২টি সামরিক কেন্দ্র আছে । ব্যতিক্রম সুইডেন । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে ৮০০০ সক্রিয় ও কার্যকর ওয়ার হেড (পারমাণবিক অস্ত্র সহ) আছে । এর মধ্যে ২০০০ যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত । মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই তারা সক্রিয় হতে পারে । আমেরিকা 'বাঙ্কার ব্লাস্টার' নামে একটা নতুন পারমাণবিক-অস্ত্র তৈরি করেছে । ব্রিটিশরাও এই প্রকল্পের শরিক । তাদের লক্ষ্য কারা ? ওসামা বিন লাদেন ? তুমি ? আমি ? জো ডক্স ? চীন ? প্যারি ? কে জানে কে ? আমরা শুধু জানি এ হল শিশুসুলভ উন্মাদনা, --পরমাণবিক অস্ত্রের অধিকার ও ভয় প্রদর্শন । এটাই আমেরিকার রাজনৈতিক দর্শন ।
কয়েক হাজার আমেরিকার মানুষ আমেরিকার কার্যকলাপে লজ্জিত, ক্ষুব্ধ এবং পীড়িত । অবশ্য এরা কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি নয় । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিনই ভয় আর অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় রয়েছে এবং তা কমার কোনো লক্ষণ নেই ।
আমি জানি প্রেসিডেন্ট বুশের অনেক সুদক্ষ বক্তৃতা লেখার লোক আছে । তবু স্বেচ্ছায় আমি তাঁর জন্য একটি বক্তৃতা লেখার ভার নিতে পারি, যেখানে জাতির উদ্দশ্যে পড়া হবে, --'ভগবান ভাল, ভগবান মহৎ । আমার ভগবান ভাল, বিন লাদেনের ভগবান খারাপ, সাদ্দামের ভগবান খারাপ । সাদ্দাম বর্বর, আমরা বর্বর নই । আমরা মানুষের মাথা কাটি না । আমরা বিশ্বাস করি স্বাধীনতায় । ঈশ্বরও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে । আমি বর্বর নই । আমি স্বাধীনতাপ্রেমী গণতন্ত্রে নির্বাচিত নেতা । আমাদের সমাজ সংবেদনশীল । আমরা সংবেদনশীল ইলেক্ট্রিক চেয়ার ও সংবেদনশীল মারণ ইন্‌জেকশন ব্যবহার করি । আমরা এক মহান জাতি । আমি একনায়ক নই । সেটা ও । আমি বর্বর নই । বর্বর ও, ও, ও । ওরা সবাই । আমার নৈতিক অধিকার (moral authority) আছে । এই যে আমার মুষ্ঠি দেখছ, এটাই হল আমার "মরাল অথরিটি", আর এটা তোমরা ভুলো না যেন ।'
লেখকের জীবন নিরাপত্তাহীন । তার সমস্ত কাজই উন্মুক্ত আবরণহীন । এর জন্য কান্নাকাটি করার মানে হয় না । নিজেরাই এটা বেছে নিয়েছি এবং এতে লেগে থাকতে হবে । সব ধরণের ঝড়-ঝাপ্টার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । যার মধ্যে তুষার ঝড়ও থাকতে পারে । নিঃসঙ্গ এই পথ । অবলম্বন বলতে নিজের হাত-পা । কোনো আশ্রয় বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নেই কোথাও । অবশ্য যদি না মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যায় । মিথ্যার আশ্রয় নিলে নিরাপত্তা মিলতে পারে, এবং বলা যায় একজন 'পলেটিশিয়ান'ও বনে যাওয়া যায় ।
এই সন্ধ্যায় আমি বেশ কয়েকবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছি । আমি এখন আমার নিজেরই লেখা 'মৃত্যু' নামের কবিতাটি পড়ছি ।

মৃতদেহটি কোথায় পাওয়া গেল ?
মৃতদেহটি কে পেল ?
তখন কী মৃতদেহটি মৃত, যখন পাওয়া গেল ?

কী ভাবে মৃতদেহটি পাওয়া গেল ?

মৃতদেহটি কে ছিল ?

কে ছিল বাবা বা মেয়ে বা ভাই
বা কাকা বা বোন বা মা বা ছেলে
মূল পরিত্যক্ত দেহটির ?

লোকটি কি মৃত ছিল ফেলে আসার সময় ?
দেহটি কী ফেলে আসা হয়েছিল ?
কে লোকটিকে ফেলে এল ?

মৃতদেহটি কী নগ্ন ছিল অথবা পোশাক পরানো ?

কী ভাবে তুমি মৃতদেহটিকে মৃত বললে ?
তুমি কী মৃতদেহটিকে মৃত বলেছ ?
তুমি মৃতদেহটিকে কতটা ভালভাবে জান ?
তুমি কী করে জানলে মৃতদেহটি মৃত ?

তুমি কী মৃতদেহটি ধুইয়ে দিয়েছ
তুমি কী ওর চোখদুটি বন্ধ করেছ
তুমি কী দেহটিকে কবর দিয়েছ
তুমি কী ওকে ফেলে চলে এসেছ
তুমি কী মৃতদেহটিকে চুম্বন করেছ

আমরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন আমাদের প্রতিবিম্বকে নিখুঁত বলেই মনে হয় । একটুখানি সরলেই প্রতিবিম্ব বদলে যায় । আমরা আসলে তাকিয়ে থাকি অনিঃশেষ প্রতিফলনের দিকে । কিন্তু কখনও কখনও লেখককে আয়নাটাকে ভেঙে ফেলতে হয় । কারণ আয়নার অপর দিক থেকে সত্য চেয়ে থাকে আমাদের দিকে ।

আমার বিশ্বাস যদিও চারিদিকে অসংখ্য প্রতিকূলতা, তবুও নাগরিক হিসেবে অসঙ্কোচে, দ্বিধাহীন-চিত্তে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের জীবনের ও সমাজের প্রকৃত সত্যটি নির্ণয় করা আমাদের দায় ও কর্তব্য ।

যদি আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে আমরা যা হারিয়েছি সেই -- "মানুষ হিসেবে মর্যাদা" ফিরে পাবার কোনো আশা নেই ।

অনুবাদ: দেবাশিস, পার্থ ও কাজল

হ্যারি ম্যাগডফ্

জন্ম ২১ আগস্ট, ১৯১৩
মৃত্যু ১ জানুয়ারি, ২০০৬

মারা গেলেন হ্যারি ম্যাগডফ । ৯২ বছর বয়েসে নিউ ইয়র্ক শহরে নিজের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হল । আমরা হারালাম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, লুণ্ঠন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শেষদিন অব্দি লড়ে যাওয়া এক মানবদরদী ব্যক্তিত্বকে । এই তো সেদিন, তাঁর ৮৯ বছর বয়সে প্রকাশিত হল আরো একটি বই, যার নাম '*উপনিবেশ ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদ*' বা *Imperialism Without Colonies*। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ স্থাপন না করেই কেন এবং কী ভাবে তার নিজের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে পৃথিবীজুড়ে চাপিয়ে দিয়েছে বৈষম্য, অত্যাচার ও যুদ্ধ সেবিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবাদী রচনা সংকলন এই বইটি । ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রথম বই '*সাম্রাজ্যবাদের যুগ*' *The Age of Imperialism* দুনিয়াজুড়ে সমাদৃত। অনুবাদিত হয় বিশ্বের ১৫টি ভাষায়। ১৯৫৯ থেকে বহুল পরিচিত পত্রিকা '*মান্থলি রিভিউ*'এর অন্যতম সম্পাদক ।

পনেরো বছর বয়সে পুরনো বইয়ের দোকানে কার্ল মার্কসের *Contribution to the Critique of Political Economy* পড়ে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন । স্মৃতিচারণে একবার বলেছিলেন, "It blew my mind"। প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞান ও অঙ্ক নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে পড়াশোনা শুরু করে, পরে অর্জন করেন অর্থনীতির ডিগ্রি । মূলত শিল্পসংক্রান্ত উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছেন । রুজভেল্টের আমলে সরকারি প্রশাসনিক পদে কাজ করলেও, পরে সোভিয়েত রাশিয়ার গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহভাজন হওয়ায় পেশাগত কাজ জোটাতে বেশ সমস্যা হয় । কলেজ জীবন থেকেই সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সত্তর বছর ধরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপদ, বৈষম্য বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করে গেছেন ।

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস্ অঞ্চলে গরীব রাশিয়ান ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম । বেট্রিসের সঙ্গে তাঁর সত্তর বছরের বিবাহিত জীবন ছিল বর্ণময় । তাঁদের দুই ছেলে । শেষদিন অব্দি নিজের আদর্শে অবিচল ও আশাবাদী ম্যাগডফ নব্বই বছর বয়সে বলেন, 'একশ ভাগ এগোনো যায় নি ঠিকই, তবু এগোনো তো গেছে । . . . হতাশাগ্রস্ত মন নিয়েও আমাদের আশাবাদী হৃদয়ে বাঁচতে হবে । ....আর, কাজ হল মানুষের কাছে পৌঁছনো ।'

সূত্র: *মান্থলি রিভিউ*, ইন্টারনেট এডিশন ও উইকিপিডিয়া ওয়েবসাইট
সংগ্রাহক: অমিত চৌধুরী

চিঠিপত্র

‘অ্যান্টিবায়োটিক ও উদ্ভিজ্জ ওষুধের কথা’ আলোচনা প্রসঙ্গে

বিওবি-র জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় আমার উপরোক্ত ‘অ্যান্টিবায়োটিক ও উদ্ভিজ্জ ওষুধের কথা’ বইটির ওপর পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

এক, ‘অ্যান্টিবায়োটিক যখন কাজ করে না’ শীর্ষক অধ্যায়ের ছবিগুলি বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করেছে -এমন কথা আমায় অনেকেই বলেছেন। কিন্তু পর্যালোচকের মতে ছবিগুলি ‘খুব বেশিরকম একঘেয়েমিতে (!) ভরা’। এই মন্তব্য পড়ে মনে হচ্ছে ছবিগুলি হয়তো ঠিক জায়গায় ছাপা হয়নি। আলোচনার মধ্যে ছাপা হলে ছবিগুলির গুরুত্ব বাড়ত।

দুই, জীবাণুনাশক জিনিসের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আমাদের উপকারী জীবাণুরা মরে যাচ্ছে আর অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুরা কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে --বিজ্ঞানীদের এই আশঙ্কার কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে (পৃ.১৬)। পর্যালোচকের মতে এসব জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হলে সঠিক পরিসংখান চাই। এসব জিনিসের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে -এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন না। আমার লেখার মধ্যেও সেরকম কোনো ঈঙ্গিত নেই।

তিন, উদ্ভিজ্জ ওষুধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাদা করে কোনো আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু ‘প্রয়োজনীয়তা অংশটি আলোচনায় অনুপস্থিত’ একথা ঠিক নয়। ‘জনপ্রিয়তার কারণ’ শীর্ষক অংশের প্রথম ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে (পৃ.২৪-২৫) পরিষ্কার ভাবে জানানো হয়েছে অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগ লোক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন না। বাধ্য হয়েই তাঁরা বিকল্প চিকিৎসার দ্বারস্থ হন যার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে উদ্ভিজ্জ ওষুধ। সবাইকার কাছে চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দিতে হলে উদ্ভিজ্জ ওষুধ যে অপরিহার্য সে কথাও বলা হয়েছে এই অংশে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের পরিপূরক হিসেবে উদ্ভিজ্জ ওষুধের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

চার, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেকে শুধু উদ্ভিজ্জ ওষুধ নয় আরও অনেক প্রাকৃতিক জিনিস (যেমন গণ্ডারের খড়গ) ব্যবহার করেন। কিন্তু উদ্ভিজ্জ ওষুধের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে এই অবৈজ্ঞানিক কারণটিকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় নি। বরং যুক্তিসঙ্গত যে সব কারণে উদ্ভিজ্জ ওষুধের জনপ্রিয়তা বাড়ছে (প্রতিবেদকের ভাষায় ‘কুসংস্কার মুক্ত প্রয়োজনীয় দিকটা’) সেগুলিকেই আমি আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছি।

পাঁচ, ভেজাল বলতে আমি বুঝি সজ্ঞানে মেশানো অপদ্রব্য। এই কারণে উদ্ভিজ্জ ওষুধের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যেসব অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয় একমাত্র সেগুলিকেই আমি ‘ভেজাল’ হিসেবে চিহ্নিত করেছি (পৃ.৩০-৩১)।

ছয়, পর্যালোচকের মনে হয়েছে ‘সমস্যা’ শীর্ষক অংশে কোনো দিশা ঠিক করে লেখা হয় নি। কিন্তু এই অংশে বলা হয়েছে, ‘...অধিকাংশ গাছ-গাছড়ার ওষুধ বাজারে ছাড়া হচ্ছে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই। ....নিয়ন্ত্রণের অভাবে অধিকাংশ গাছ-গাছড়ার ওষুধ আমাদের উপকার করার বদলে ক্ষতিই করছে। ‘জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হচ্ছে’ (পৃ. ২৬)। আলোচনার ‘দিশা’টা যে কি -এই অংশটি পড়ে সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। পরবর্তী অংশগুলিতে এই সব সমস্যাই দৃষ্টান্তসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সাত, শিশি বা কৌটো ভর্তি ওষুধ মানেই পেটেন্ট করা ওষুধ --এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। বিভিন্ন গাছপালার শেকড়, ছাল, পাতা, ফুল বা ফল থেকে তৈরি অনেক ওষুধ শিশি বা কৌটোয় বাজারে বিক্রি করা হয়। এসব ওষুধের বেশির ভাগই বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই। সুতরাং এসব ওষুধের পেটেন্ট থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আট, উদ্ভিজ্জ ওষুধ নিয়ে আলোচনায় খুব বেশি পরিসংখ্যান আমি দিতে পারি নি। কারণ পরিসংখ্যান আমার হাতে ছিল না। তবে অনিয়ন্ত্রিত উদ্ভিজ্জ ওষুধের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে যে এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে --এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত।

নয়, বইটি প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশন সংস্থা থেকে। তাই দাম কমানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি তাঁদেরই হাতে, লেখকের হাতে নয়।

দশ, চিনা 'পেটেন্ট ওষুধের' খারাপ দিকগুলোর উল্লেখ পর্যালোচকের কাছে 'দৃষ্টিকটু' মনে হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর নিরিখে এই সব তথ্য 'একেবারেই গুরুত্বহীন' মনে হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, এই অধ্যায়ে যে সব ওষুধের ব্যবহার নিয়ে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার কোনোটাই পেটেন্টেড ওষুধ নয়। অপরীক্ষিত, অনিয়ন্ত্রিত উদ্ভিজ্জ ওষুধ। এইসব ওষুধ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বড় একটা অংশ জুড়ে আছে চিনা ওষুধ। ফলে এইসব ওষুধ সম্পর্কে অনেক অভিযোগও আসছে। দুবছর আগে (নভেম্বর ২০০৩) সাংহাই থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে -"To prevent the toxicity of Chinese herbal drugs, we must strengthen the management of Chinese herbal drugs. On the other hand, doctor's recognition of the toxicity of Chinese herbal drugs should be enhanced."

সম্প্রতি California Department of Health Services, Food and Drug Branch-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "Traditional Chinese medicines (TCM) are popular in the United States and Asian and non-Asian consumers are using the product for disease treatment and health preservation. As more people are using TCM products, there are increased reports on adverse reactions. ....To minimize the adverse reactions from TCM and protect the public, there must be adequate laws and regulations to ensure that products are manufactured with the highest standards." এরকম আরও রিপোর্ট প্রায়ই বেরোচ্ছে বিভিন্ন মেডিকেল জার্নালে। সেগুলো পড়লে যে কেউ বুঝবেন অনিয়ন্ত্রিত উদ্ভিজ্জ উষুধ ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেন আমি একাধিক চিনা ওষুধের দৃষ্টান্ত দিয়েছি এবং আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের নিরিখে এইসব দৃষ্টান্ত কতখানি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু চিনা উদ্ভিজ্জ ওষুধই ক্ষতিকর বাকি সব উদ্ভিজ্জ ওষুধ নিরাপদ, এমন কথা আমার আলোচনায় কোথাও বলা হয় নি। সুতরাং এইসব উদাহরণ দৃষ্টিকটু মনে হওয়ারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। পরিশেষে আমার বইটি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ধন্যবাদ।

মাধব চট্টোপাধ্যায়, হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ
(E-mail: mkc@ccmb.res.in)

রিপোর্ট

ভাঙন আবার ভাঙন আবার গঙ্গা ফোঁসে

কয়েক বছর ধরে বর্ষা শুরু বা তার পরপরই মালদহ-মুর্শিবাদে গঙ্গার পাড় ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটছে । এবছরেও তার ব্যতিক্রম হয় নি । 'দোহার' নামের সংস্থা --গত ১৯ নভেম্বর ২০০৫-এ মহাবোধি সোসাইটি হলে এই বিষয় নিয়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন ।

এই আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে জানানো হয়েছে: ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বেলা দেড়টার সময় মালদহ জেলার পঞ্চানন্দপুরের একটি বাজারসহ তিনটি গ্রাম গঙ্গায় তলিয়ে যায় । এর ফলে নিরাশ্রয় হন প্রায় ৫০০টি পরিবার। সামনেই ছিল দুর্গা পূজা। গ্রামেই তৈরি হচ্ছিল প্রতিমা । কিন্তু ভাঙনের মুখে অকাল ভাসান দিতে হয় প্রতিমা ।

নদী বিশেষজ্ঞ শ্রী কল্যাণ রুদ্র ছিলেন এদিনের মূল বক্তা। তার বক্তব্যের মধ্যে অনেক প্রসঙ্গই ধরা পড়ল। সরকারি নথিপত্রে ঘরছাড়া মানুষের কোনো হিসেব নেই । কিন্তু বেসরকারি মতে তার সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি । গত তিন দশকে ভাঙন প্রতিরোধে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা । ২০০৫ সালেও মালদহে গঙ্গাপাড়ের প্রায় তিন কিলোমিটার জুড়ে বোল্ডার ফেলা হয়েছিল । খরচের হিসেব দেখানো হয়েছে ৩২ কোটি টাকা । এ সব-ই ফের চলে গেছে গঙ্গার গ্রাসে ।

এত সবের পরেও কেন বিকল্প ভাবনা ভাবা হয় না ? --ভুক্তভোগীদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না ? মন্ত্রী-আমলারা নিজেরাই ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । কিন্তু কেন নিচ্ছেন ? প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক । পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দা ভাঙন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, একদা সম্পন্ন পরিবারের একজন কিন্তু এখন সবহারা, শ্রী কেদার মণ্ডলের কথায় জানা গেল জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার চান নি গঙ্গার পাড়ে বোল্ডার ফেলে নদীকে বাঁধতে । এ-ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রায় নাছোড় । কিন্তু রাজনীতির নানান কারিকুরিতে তাকে কোণঠাসা করে এ-কাজের টেণ্ডার ডাকা হয় । এবং যথারীতি একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি হয়েছে ।

সুতরাং এখন তাঁরা পাথর ফেলে গঙ্গাপাড় বাঁধিয়ে ভাঙন প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন । বরং নদী মুক্ত থাকুক । সবহারা ওই মানুষরা চান একটু পুনর্বাসন । একটু আশ্রয় । একটু পরিচয়, তা সে যে-রাজ্যের-ই হোক । শেষ হোক ভাঙনের নেপথ্যে চলতে থাকা এই এক অন্য রাজনীতি-অর্থনীতির ঠিকাদার-মাফিয়া-রাজনৈতিক নেতাদের ধূর্তামি । বহুদিন ধরে তাঁরা বলে আসছেন এই কথা । কিন্তু কেউ কান দেয় নি। সুরাহা হয় নি সমস্যার । নানা দিক থেকে অবস্থা অবনতির দিকেই যাচ্ছে । ভাঙনের ফলে মানুষ যত বাস্তুচ্যূত হয়েছে, লাভ হয়েছে রাজনীতির কারিগরদের ।

আলোচনাচক্রের শেষে ছিল সৌরভ সরঙ্গীর ছবি 'গঙ্গাভাঙন' । নিঃসন্দেহে ভাল প্রয়াস । সভার শেষে, ভাঙনের দৃশ্য যাতে ধরে রাখা যায় সেজন্য বাস্তুহারা মানুষদের হাতে মুভি ক্যামেরা তুলে দেওয়ার জন্য সাহায্যের আবেদন জানান হয়। প্রশ্ন জাগছিল বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার অবস্থায় থাকবেন কী ?

ত. ব.

‘গুগুল-আর্থ’ ভয় ধরিয়েছে ‘বিগ-ব্রাদার’দের

‘বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং’--শব্দবন্ধটি শুনলেই কেমন গা শির শির করে, তাই না ? সারাক্ষণ ঘাড়ের কাছে কারো নিঃশ্বাস পড়ছে ভাবলেই শিউরে উঠতে হয় । আর সেটা যদি পুলিশ বা রাষ্ট্রের হয় তাহলে তো কথাই নেই । রাতের ঘুম ছুটে যাবার অবস্থা হয় । তা এতদিন ব্যাপারটা একপেশে ছিল । পুলিশ তথা রাষ্ট্রের-ই একচেটে অধিকার ছিল নাগরিকদের ওপর নজরদারি করার । যেমন এখন করছেন বিশ্বের এক নম্বর গণতন্ত্রী (!) মার্কিন প্রসিডেন্ট জর্জ বুশ। বেছে বেছে মার্কিন নাগরিক ও ওই দেশে ভ্রমণরত লোকজনদের ওপর লুকিয়ে নানান রকম নজরদারি চালাচ্ছেন তিনি - দেশ বিপন্ন এই অজুহাতে। হ্যাঁ, অজুহাত-ই । কারণ বিপন্নতার পরিস্থিতিটাই তো নিজেদের তৈরি করা ।

সাধারণ মানুষের হাতে এতদিন কোনো উপায় ছিল না, বিগ-ব্রাদাররা কী কর্ম করছেন সেটা দেখার । কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় আর তেমন রইল না । ইন্টারনেটের দৌলতে চাকা এবার ঘুরতে শুরু করেছে । ঘরের দরজা এঁটে ভিতরে বসে তেনারা কী করছেন জানার উপায় এখনও হয়নি বটে, তবে আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে যা কিছু করছেন সেসব কর্মকাণ্ডের ছবি রাম-রহিমেরা চাইলেই কিন্তু দেখতে পারেন এখন !

এই দেখার ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিন গুগুল্। আকাশ থেকে দেখে কোন্ অঞ্চল কেমন দেখাবে তার থ্রি-ডি ছবি দেখতে পাবেন । সেই জায়গার নাম বা সেখানকার অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে সার্চ করলেই সেখানকার স্যাটেলাইট-ছবি ফুটে উঠবে কমপিউটারের স্ক্রিনে । এখন যে ধরণের ছবি মিলবে তাতে বাড়িঘর পথঘাট গাড়ি গাছপালা জলাশয় পাহাড় নদী সব পরিষ্কার বোঝা যাবে । আগামীদিনে মানুষজনও হয়তো চেনা যাবে। এজন্য কোনো পয়সা লাগবে না । লাগবে সম্প্রতি কেনা একটি কমপিউটার। ইন্টরনেট যোগাযোগের জন্য ব্রডব্যাণ্ড কানেকশন । আর এজন্য প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার --গুগুল আর্থ। তবে সেটাও বিনে পয়সায় পাওয়া যাবে। নেট থেকে ডাউনলোড করে নিলেই হবে । অনেক ওপর থেকে নীচের দৃশ্য দেখতে দারুণ লাগে তাই না? উঁচু বাড়ি থেকে তেমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কারো কারো আছে । আরো ওপর থেকে দেখতে কেমন লাগে দেখেছেন যাদের প্লেনে চড়ে নীচের দিকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্লেনে না চড়েও সেটাই দেখার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন গুগুল্ কোম্পানি । আর সেই সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই উৎফুল্ল মানুষ ।

না, সবাই উৎফুল্ল নন। ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে । সে প্রতিবাদ আমার আপনার মতো ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে নয় । প্রতিবাদ উঠেছে নানান দেশের সরকারের তরফ থেকে। তথা সরকারের ওপরমহল থেকে । যেমন আমাদের দেশের মাননীয় প্রসিডেন্ট খোদ আবদুল কালাম মহাশয়ের তরফ থেকে । তিনি গত অক্টোবরে হায়দরাবাদে পুলিশ আফিসারদের এক সভায় এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । বলেছেন এটা কী রকম ব্যবস্থা ? আমাদের পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতিভবন, সরকারি অফিসগুলি তো আর সুরক্ষিত রইল না । আতঙ্কবাদীরা চাইলেই তো তাক করতে পারবে সেসব টার্গেটে । আর ব্রিজ, পোর্ট, তৈলশোধনাগার, মিলিটারি-নিউক্লিয়ার বেস তথা সেখানকার তাবৎ কর্মকাণ্ড সব তো হাট-খোলা হয়ে গেল !

হ্যাঁ, হয়ে গেল। তো কী হল ? এত ঘাব্ড়াবার কি আছে । আপনারা তো কোনো গর্হিত কর্ম করছেন না যে লুকতে হবে । নাকি করছেন ? সেজন্য এত উদ্বেগ ! একজন বিজ্ঞান-পূজারীর মুখে যে এই উদ্বেগ মানায় না সেটা ওঁকে সম্ভবত কেউ মনে করিয়ে দেয়নি । আর দিলেও তিনি কান দেন নি হয়তো । কারণ এমন গোপনীয়তার ঘেরাটোপেই জীবনের অনেকটা সময়ের বিজ্ঞান-সাধনা করেছেন তিনি । তাই এত খোলামেলা ব্যাপার-স্যাপার তাঁর না-পসন্দ্ ।

ভারত সরকারের তরফে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সেক্রেটারি নাকি গুগুল্ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছেন এ ব্যাপারে কথা বলতে। কি কথা বলেছেন জানি না । কি বলার আছে তাও বুঝতে পারছি না । তবু যোগাযোগ করেছেন । ওপর মহলের নির্দেশ । কি আর করা। আসলে আমাদের দেশে অদ্ভুত একটা নিয়ম আছে । সেই ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছিল । ব্রিজ, সরকারি ভবন, কল-কারখানা ইত্যাদির আকাশ থেকে ছবি নেওয়া যাবে না । সম্ভবত এসবের যে কোনো ধরণের ছবি তোলাই নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, এবং দেখাও নিষিদ্ধ। অন্তত একটি সরকারি অফিসে তেমনটাই বলা হয়েছিল । সেই অফিসে আকাশ থেকে তোলা কলকাতা ও তার আশপাশের ছবি আছে। কলকাতার আশপাশের জলাশয়ের অবস্থা কেমন দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম একজন অফিসারের কাছে। তিনি বলেছিলেন, এসব সিক্রেট। বাইরের লোককে দেখানো যাবে না । সেই অফিসার ভদ্রলোক যদি জানতে পারেন গুগুল এমন ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম’ করেছে তাহলে খুবই মর্মাহত হবেন আশঙ্কা করছি ।

শুধু ভারত নয় এই উদ্বেগ অনেক দেশেরই । রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি অনেক দেশ থেকেই এই নিয়ে আপত্তি উঠেছে। সব দেশেরই ‘মিলিটারি-ইনস্টলেসন’ নিয়ে এক ধরণের অবসেসন থাকেই । ফলে তারা গুগুলের এই সার্ভিসে বিরক্ত হবেন সন্দেহ নেই। তবে কাণ্ডজ্ঞান আছে যাদের তারা চুপচাপ-ই থাকবেন । কারণ বহুদিন থেকেই এই

ধরণের ছবি-টবি পাওয়া যাচ্ছিল । এসব ছবি বিক্রির জন্য আলাদা কোম্পানি-ই আছে । তাদের কাছ থেকে ছবি কিনতে হয় পয়সা দিয়ে । এখন সেটা বিনি পয়সায় পাওয়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু বোঝাই যায়, বিনি পয়সার ছবি সেসব ছবির মতো কোয়ালিটির হবে না । কোয়ালিটি ছবি পয়সা দিয়েই কিনতে হবে । আর রাষ্ট্রপতি ভবনের ওপর বোমা যারা ফেলবেন বলে স্থির করবেন, তাদের রাষ্ট্রপতি ভবনের হাই-রেজোলিউসন এরিয়াল-ছবি কিনতে পারার রসদ আছে ধরেই নেওয়া যায় ।

তাই গুগুলের এই আকাশ থেকে জমি দেখার ব্যবস্থায় বাগ্‌ড়া না দেওয়া হোক চাইব । আমরা আর আকাশ থেকে কী ওয়াচ করব। আপনারা যা করছেন তা এতটাই ল্যাংটো যে লুকিয়ে ওয়াচ করার কিছু নেই । বরং শুনেছি আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনের গোলাপ বাগিচাটা নাকি দেখার মতো জিনিস । এমনিতে সেটা দেখার সুযোগ নেই । এই ব্যবস্থা থাকলে আকাশ থেকে ওই বাগিচার ছবিটা অন্তত দেখতে পাব । আপাতত বাগিচা অবধি-ই। গোলাপ দেখার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে । তবুও দেখা যায় কিনা তার চেষ্টাটা তো অন্তত করতে পারি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাতে বাগ্‌ড়া না দেবেন আশা করি ।

র. চ.

ডিসেম্বর ২৩, ২০০৫

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার হংকং-বৈঠক ঘিরে বিক্ষোভ প্রতিবাদ

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের ষষ্ঠ অধিবেশন হল চিনের হংকং শহরে । ২০০৫-এর ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর। এর আগে এই আলোচনা সভা হয়েছিল ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোর কানকুন শহরে । তার আগের বৈঠক হয়েছিল ২০০১-এর নভেম্বরে কাতারের দোহাতে। তার আগে হয়েছে ইউ.এস.এ-র সিয়াটেলে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে । বিশ্বজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধ ও মুক্ত করতে চলেছে এমন ধারাবাহিক আলোচনা বৈঠক। উদ্দেশ্য দুনিয়াজুড়ে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথের বাধাগুলো অপসারণ করা ।

চাইলেই বাধাগুলিকে নিমেষে অপসারণ করা যায় এমন নয়। অথচ সে চেষ্টাই চলছে । বাধাগুলি তৈরি হয়েছিল প্রত্যেকটি দেশের নিজ নিজ দেশের প্রকৃতি ও পরিস্থিতির বিচারে । সব দেশের অবস্থা সমান নয়। সে বিভিন্নতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে নয় । যদিও তার বিচার করা হচ্ছে কেবল সেই মাপকাঠিতেই । এই তারতম্যের নাম হয়েছে উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নতিশীল-দেশ এইভাবে। অথচ আচার-ব্যবহার, ভাষা-সংস্কৃতি, অভ্যাস-সামাজিক প্রথা, এমন হরেক ব্যাপারে দেশে দেশে প্রভেদ রয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলছে এই একীকরণের প্রয়াস ।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চাপেই হচ্ছে এসব। উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যে বিপুল উৎপাদন-ক্ষমতা অর্জন করেছে তারা তাই দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ ভোগ্য-সামগ্রী উৎপাদন করছে, সেগুলো হজম করার মতো এত মানুষ নেই তথাকথিত সেই উন্নত দেশগুলিতে । কিন্তু উৎপাদন তো থেমে থাকতে পারে না। তাহলে ? তাহলে খেতে যারা চায় না বা চাইলেও খাবার ক্ষমতা যাদের নেই তাদেরকেই খাওয়াতে হবে এসব জিনিস। এত সব আলোচনা সেই খাওয়ানোর চেষ্টাতেই । সেজন্যই মুক্ত বাণিজ্যের হাঁকডাক । ভাবখানা যেন এত এত ভাল জিনিস তৈরি হচ্ছে, সেসব উন্নত দেশের লোক একা ভোগ করবে? সেটা খারাপ দেখায় । তাই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে। এই 'মহৎ উদ্দেশ্যে' উন্নত দেশগুলির উৎসাহে গঠিত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা । এখন যাদের খিদে নেই তাদেরও বলা হচ্ছে উন্নত দেশের কায়দায় তাদের জীবনযাপনের উপযোগী জিনিসপত্র ব্যবহার কর। এই পণ্যসামগ্রী ও পরিষেবা এখন অবাধে ঢুকতে দিতে হবে সব দেশে, এই দাবি উঠেছে। চলছে রাউন্ডের পর রাউন্ড আলোচনা। না, একপেশে দাবি করছেন না তারা । বলছেন তোমরাও তোমাদের মাল বেচতে পার উন্নত দেশের বাজারে এসে ! যেন চাইলেই তাদের জিনিস বিকোবে সেই বাজারে! হ্যা, বিকোবে কিছু জিনিস। তাদের ক্ষেতে খামারে উৎপাদিত কৃষিপণ্য। যেগুলি হল গরিব দেশের মানুষের মুখের গ্রাস। তাও জলের দরে । অথবা অতিরিক্ত দূষণকারী শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য। যা জীবনের বিনিময়ে উৎপাদিত ।

এই অসম লেনদেনের ব্যাপারটা মানতে চাইছে না তথাকথিত অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশের লোকজন। যেখানেই বৈঠক হয় সেখানেই দলবল নিয়ে ধেয়ে যায় তারা । তাদের সাথে থাকেন উন্নত দেশেরও বহু মানুষ ও সংগঠন। হাজার হাজার লোকের জমায়েত হয়। যেখানেই মিটিং হয়েছে সেখানেই এমন জমায়েত হয়েছে । সিয়াটেলে, কানকুনে, দোহায় এবং এবার হংকং-য়ে। মিছিল মিটিং করেছে তারা । বিক্ষোভ দেখিয়েছে এই অসম লেনদেনের ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশগুলো কিভাবে পাল্লা দেবে অর্থনৈতিকভাবে, প্রযুক্তিতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত অগ্রসর সব দেশের সাথে ? বাধানিষেধের প্রাচীর তুলে নিলে প্রাচীন পদ্ধতির শিল্প-কৃষি উৎপাদনের যেটুকু নড়বড়ে ব্যবস্থা আছে সেসব দেশে, অবাধ বাণিজ্যের স্রোতে তাও ভেসে যাবে। দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে । তাই তারা মনেপ্রাণে চায় এই আলোচনা বৈঠক ভেস্তে যাক ।

ভেস্তে না গেলেও এই বিক্ষোভ আন্দোলনে থমকে যায় বৈঠক। বিলম্বিত হয় আলোচনা । এতে কিছু কিছু দেশের সুবিধেই হচ্ছে। এই অবসরে নিজের ঘর কিছুটা গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছে । কিন্তু আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশগুলির তো গোছাবার কিছু নেই। ফলে তাদের সর্বনাশ । যদিও তাদের নানান সুবিধাদি দেবার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই আশ্বাসের অল্পই কার্যকর করা হচ্ছে । আর হলেও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন সুষ্ঠু নয় যে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে এরা। এবারের বৈঠক যেহেতু হল পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে তাই এবারের বিক্ষোভ আন্দোলনে বিপুল সংখ্যায় সামিল হয়েছেন এই ভূখণ্ডের মানুষ । ইওরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, কাম্বোডিয়ার হাজার হাজার কৃষিজীবী, মৎসজীবী, গৃহস্থ-কর্মী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খেটে খাওয়া মানুষ হাজির হয়েছিলেন এই সমাবেশে । হাজার দশেক বিক্ষোভকারী সামলাতে নয় হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল। যদিও আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটনা ঘটল। কিছু লোক গ্রেপ্তার হলেন । তাদের ছাড়ানোর দাবিতে ফের বিক্ষোভ দেখানো হল ।

র. চ.

মনসান্টোর বিটি-তুলোর বীজ কিনে চাষির মাথায় হাত

বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে চাষের বীজ তৈরি হচ্ছে । দুনিয়াজুড়ে বড় বড় বায়োটেক কোম্পানি নেমে পড়েছে এই ব্যবসায়। এদেশের বাজারে ঢোকার লড়াই চালাচ্ছে তারা। কেউ কেউ ঢুকেও পড়েছে । যেমন মনসান্টো। তাদের তুলোর বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে এদেশের ক্ষেত-খামারে । এই ধরণের জি-এম (জিন-মডিফায়েড) বীজের পক্ষে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হচ্ছে। তবে এই দাবি নিয়ে বিতর্কও চলছে দুনিয়াজুড়ে। ইওরোপে, আমেরিকায় । --এখানেও। এর সাথে জড়িয়ে গেছে হাজার হাজার চাষির বাঁচা মরার প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চাষি এই বীজ-ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ঋণের বোঝা বইতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছে বা চাষের ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে । --অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকে । তবুও মনসান্টোর তুলোর বীজ 'বোলগার্ড বিটি কটন' ব্যবহারের অনুমতি বন্ধ হয়নি। হবার কথাও নয় । এজন্য সোজা বাঁকা সব রাস্তাই চেনা 'মনসান্টো'র। যদিও ঝামেলাতেও পড়তে হচ্ছে মাঝে-মধ্যে । যেমন ইন্দোনেশিয়াতেই ঘুষের কেলেঙ্কারিতে পড়ে এদের একবার ফাইন দিতে হয়েছিল পনেরো লক্ষ ডলার। তাতে কী ?
২০০৪ সালে মনসান্টো একটি এজেন্সিকে দিয়ে সার্ভে করিয়ে দেখায় যে, সারা দেশের গড় হিসেবে এই বীজ ব্যবহারকারীদের উৎপাদন বেড়েছে ৫৮ শতাংশ আর আয় বেড়েছে ৬০ শতাংশ । আর অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে ফলন বেড়েছে ৪৬ শতাংশ, কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে ৬৫ শতাংশ এবং চাষিদের লাভের অঙ্ক বেড়েছে ৪২ শতাংশ । অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল জেলার জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার একটি সমীক্ষা করে দেখে যে, এই বীজ বিক্রির অনুমতি দেবার সময় মনসান্টো কোম্পানি ফলাফল নিয়ে যে ধরণের আশ্বাস দিয়েছিল প্রকৃত অবস্থা তা নয় । লাভের বদলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়েছে বহু চাষি । মনসান্টোর সাথে চুক্তি অনুযায়ী এমন ক্ষেত্রে ওই কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো অদৃশ্য হাতের খেলায় সেই রিপোর্টের পরিসংখ্যান বদলে যায় । এবং মনসান্টো কোনোরকম ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে । এই জালিয়াতির খবর ফাঁস করে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বোদয় ইয়োথ আর্গানাইজেশন ও ভারতের গ্রিনপিস শাখা যৌথভাবে। কিন্তু এই কোম্পানির বীজের ব্যবহার বন্ধ করা দূরে থাক, আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার !
আসলে জি-এম প্রডাক্ট নিয়ে দুনিয়াজুড়ে এক বিরাট খেলা চলছে । এর গবেষণার পেছনে বিপুল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছে বহু দেশের সরকার এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলো । ফলে এর বিরুদ্ধে কোনোরকম কথা শুনতে রাজি নয় তারা । এই কেলেঙ্কারির জালে জড়িয়ে যাচ্ছে নামী-দামি গবেষণা সংস্থাও । কিছুদিন আগে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন কেইম ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড জিলবারম্যান মনসান্টোর তৈরি জি-এম কটন-এর বীজ-এর সাফল্য নিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *সায়েন্স*-এ একটি গবেষণাপত্র ছাপিয়ে হৈ চৈ ফেলে দেয় । তাদের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশে মনসান্টোর এই বীজ ব্যবহার করে ফসলের বৃদ্ধির হার হয়েছে ৮০ শতাংশ। এমন অসম্ভব দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ।
কৃষি বিজ্ঞানী আব্দুল কোয়ায়ুম ও কিরণ শাখারি দীর্ঘ তিন বছর ধরে অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল, নালগোন্ডা, আদিলাবাদ এবং কুরনুল এই চারটি জেলার ৮৭টি গ্রামে তুলো-চাষের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, মনসান্টোর বোলগার্ড বিটি-কটন বীজ সাধারণভাবে ব্যবহৃত তুলো বীজের থেকে কোনো দিক দিয়েই বেশি ফলপ্রসূ নয় । তারা দেখেছেন যে, ছোট চাষিদের ক্ষেত্রে বিটি-তুলোর চাষ একেবারেই লাভজনক নয় । দেখা গেছে বিটি-তুলোর তুলনায় প্রথাগত বীজের ফলন ১০ শতাংশ কম খরচে ৩০ শতাংশ বেশি । তারপর বিটি-তুলোর চাষে কীটনাশকের ব্যবহার কমে না । চাষের মোট

ব্যয় দেখা গেছে প্রথাগত চাষের ক্ষেত্রেই কম । আর বিটি-তুলোয় গাছের মূলে এক ধরণের পচনের জন্য জমির ক্ষতিও হয় ।
অন্ধ্রপ্রদেশের তুলো-চাষিদের ওপর দুটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কমিউনিটি ট্রাস্ট । চিত্রদুটির নাম "*Why are Warangal Farmers angry with Bt Cotton*" এবং "*Bt cotton in Warangal: A Three year Fraud*". k¡-a এই সমস্ত তথ্য দিয়ে তুলো-চাষিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে । ইওরোপের নানান দেশে দেখানো হয়েছে ছবি দুটি ।
তথ্য যাই বলুক মনসান্টোর বীজ এদেশের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। আরো আরো রাজ্যে তার ব্যবহার বিস্তৃত হচ্ছে । এতদিন মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ছটি রাজ্যেই এর ব্যবহার সীমিত ছিল । এবার পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের মতো উত্তরের রাজ্যগুলিতেও এই বীজ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নবদান্যর ড. বন্দনা শিবা এবং ভারত কৃষক সমাজ-এর ড. কৃষণবীর চৌধুরির এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনো ফল হয়নি । হবার কথাও না। কারণ এর সাথে জড়িত বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ । এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে সরকারি নীতির কথা স্মরণ করা যেতে পারে । এদেশের বায়োটেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ঠিক হয়েছে যে সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগের সাথে হাত ধরাধরি করে এগোবে । আগামী ২০১০ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে। যাতে নাকি অন্তত দশ লক্ষ চাকুরির সংস্থান হবে । ২০০৩-০৪ সালে বায়োটেক-শিল্পে বৃদ্ধির হার ছিল ৩৯ শতাংশ। এবছরের মে মাসে দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক মন্ত্রীর ঘোষণা এটি। সরকারের নীতি নিয়ে নানান বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পপতি থেকে সামাজিক কর্মী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক'শ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগের নীতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন দেশি বায়ো-টেক ক্ষেত্রের শিল্পপতিরা। আর বন্দনা শিবা-র মতো সামাজিক কর্মীদের অভিযোগ যে সরকার যথেষ্ট বিচার বিবেচনা ছাড়াই ক্ষতিকর বায়োটেক প্রোডাক্ট আমদানির ছাড়পত্র দিচ্ছে এবং এদেশের বিজ্ঞানীদের বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির দাসে পরিণত হতে সাহায্য করছে ।

র. চ.